সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে লিখিত। ১৯৫৫



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রধান শিক্ষক কল্যাণগড় বিদ্যামন্দির

ও

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

নব ভারত পাবলিশার্স

১২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
১৩৬২

মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র

১২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও ২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।





ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

॥ এক ॥

হুগলি জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম।

গ্রামের নাম কামারপুকুর। সেই গ্রামে এখন থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সৎ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি যেমন ছিলেন ভালোমানুষ, তেমনি নির্ভীক ও আচারনিষ্ঠ। গ্রামের সবাই তাঁকে খুব মান্য করতো। শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতো দেবসেবায়, পূজা-অর্চনায়। তাঁর মতো ধার্মিক কামারপুকুরে আর ছিল না।

ক্ষুদিরামের স্ত্রীর নাম চন্দ্রা দেবী। স্বামীর মতো তিনিও ছিলেন ধার্মিক, সতীলক্ষ্মী গৃহস্থবধূ।

কিন্তু এঁরা ছিলেন বড়ই গরিব। অভাব আর অনটন যেন পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছিল তাঁদের সংসারে। কিন্তু শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মভাবের অভাব ঘটেনি কোনদিনই। অতিথি-সেবায় তাঁরা ছিলেন সদা-তৎপর। কোনো দিন কোনো অতিথি বা ভিখারী তাঁদের বাড়িতে এলে না খেয়ে ফিরতো না। ঘরে যা থাকতো তাই দিয়েই ক্ষুদিরাম আর তাঁর স্ত্রী পরম যত্ন

ক'রে অতিথি বা নর-নারায়ণের সেবা করতেন। নিজেরা অনাহারে থেকেও কোনো কোনো দিন তাঁরা এইভাবে মানুষের সেবা করেছেন। অথচ, তাঁদের মুখের হাসি কোনোদিনই মিলায়নি, পারিবারিক অভাব আর দৈহিক ক্লেশকে তাঁরা যেন অনায়াসেই জয় করতে পেরেছিলেন। গরিব হ'লেও ক্ষুদিরাম আর স্ত্রী চন্দ্রাদেবীর মানসিক সুখশান্তির অভাব ছিল না।

এই গরিব ব্রাহ্মণ-পরিবারে এখন থেকে একশ বাইশ বছর আগে (ইংরেজি ১৮৩৩ সালে) যে-শিশুর জন্ম হয় তার কাহিনীই শোনাতে বসেছি তোমাদের। সে-শিশু আর কেউ নয়, দক্ষিণেশ্বরের সাধকপুরুষ প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকে যাঁকে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলাকার নাম গদাই। আদর ক'রে সবাই বলতেন গদাধর। গদাই হ'লো ডাকনাম, আর পোশাকী-নাম বা ভালো নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

পরম এক শুভক্ষণে গদাধরের জন্ম হয়েছিল বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, আকাশের গায় জ্বল্‌জ্বল্ করছে শুকতারা, একটু বাদেই ভোর হবে। ঠিক এমনি ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হলেন গদাধর, উত্তরকালের শ্রীরামকৃষ্ণ।

শঙ্খ বেজে উঠ্‌লো ক্ষুদিরামের বাড়িতে। প্রতিবেশী বৌ-ঝিরা এলেন ছুটে। এসে দেখলেন আঁতুড়-ঘর আলো ক'রে নবজাতক হাসছে মিটিমিটি। কি সুন্দর ছেলে! যেমন গায়ের রং, তেমনি স্বাস্থ্য। সকলেই খুশি হলেন ছেলে দেখে। খুশি হ'লেন ক্ষুদিরাম, খুশি হ'লেন চন্দ্রাদেবী।

॥ দুই ॥

শিশু গদাধর বড় হ'তে থাকে দিন দিন। একে গৌর বর্ণ, তায় সুঠাম দেহ। যে দেখে, সেই কোলে নিয়ে তাকে আদর করে।

গদাধরের বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, সেই সময় থেকেই তার বুদ্ধি দেখে সকলে অবাক্ হয়। তা'ছাড়া, ভারি স্মরণশক্তি ছিল তার। একবার যা শুনতো, তা আর ভুলতো না কখনও। কিন্তু ভারি চঞ্চল ছিল সে।

ছেলেকে কাছে বসিয়ে ক্ষুদিরাম কত গল্প করতেন, পুরাণের কথা, রামায়ণ-মহাভারতের কত সব কাহিনী। বালক গদাধর চঞ্চল হলেও, গল্প শোনার সময় একেবারে শান্তশিষ্ট লক্ষ্মীটি। মন দিয়ে সে যে-সব গল্প শুনতো, পরক্ষণেই কেউ তা শোনাতে বল্‌লে, হুবহু সে ব'লে যেত,—কোনো কথা বাদ যেত না। পাঁচ-ছয় বছরের বালকের মুখে এই রকম পুনরাবৃত্তি শুনে সকলেই খুব অবাক্ হয়ে যেতেন।

গদাই ছিল গ্রামের সকলের প্রিয়পাত্র। ছেলে-বুড়ো সকলেই তাকে খুব ভালোবাসতো। গ্রামের গৃহিণীরা আদর ক'রে তাকে খাওয়াতেন। কোনো বাড়িতে নতুন কিছু খাবার-দাবার তৈরি হ'লেই গদাই-র ডাক পড়তো সে-বাড়িতে। ক্ষুদিরামের বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেও, সে গদাই-র জন্যে কিছু-না-কিছু সঙ্গে আনতই।

শুভদিন দেখে ক্ষুদিরাম গদাইকে গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দিলেন।

পাঠশালায় যেতে গদাই-র আনন্দের সীমা ছিল না। কারণ কত সব ছেলে। তারই সমবয়সী তারা। তাদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করা যাবে, হৈ-হুল্লোড় করা যাবে। কিন্তু যেদিন সে প্রথম অঙ্কের বই দেখলো, সেইদিনই পাঠশালায় যাবার আনন্দ তার উবে গেলো। উরে বাবা, যত সব খটমট ব্যাপার। কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ, শুভঙ্করী! গদাই পাঠশালায় গেল বটে, কিন্তু পড়াশোনায় তার আর কোন আগ্রহ রইলো না। লিখতে-পড়তে যে এত সব গোলমেলে ব্যাপার, সে যেন কোনদিন তা ভাবতেই পারেনি! ফলে লেখাপড়া তার যা হ'লো, তা খুবই সামান্য। কিন্তু বই প'ড়ে গদাই যা না শিখেছিল, তার ঢের বেশি সে শিখেছিল তার বাবার মুখে গল্প শুনে, লোকের সঙ্গে মিশে।

পাঠশালায় ঘণ্টা কয়েক ধ'রে আটকে থাকা গদাই-র মোটেই ভালো লাগতো না। তাই, পাঠশালা থেকে পালিয়ে সে গুটিকয়েক সঙ্গী নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো, খেলা করতো, হৈ-হুল্লোড় ক'রে দিন কাটাতো। বাড়ি ফিরে এসে কিন্তু একেবারে শান্তশিষ্ট! যেন কত লেখাপড়া ক'রে পাঠশালা থেকে ফিরে আসছে।

ছেলেবেলা থেকেই গদাই ছিল ডানপিটে। ভয়ডর কাকে বলে, সে যেন তা জানতো না। কামারপুকুর গ্রামে ছিল দুটি শ্মশান। গদাই প্রায়ই সেই শ্মশান দু'টিতে ঘুরে বেড়াতো।

অনেক সময় একলাই চ'লে যেত সেখানে। চুপ্টি ক'রে ব'সে থাকতো, ভাবতো কত কী।

চঞ্চল হ'লেও, গদাই মাঝে মাঝে এমন শান্ত হ'য়ে যেত যে, তা দেখে বাপ-মা, পাড়া-প্রতিবেশীর বিস্ময়ের সীমা থাকতো না। মনে মনে তাঁরা আশঙ্কিতও হ'য়ে উঠ্তেন। ভাবতেন, এ আবার কেমন ধারা! সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো বোবা হ'য়ে মাঝে মাঝে কী ভাবে গদাই।

প্রকৃতির সঙ্গে ভারি ভাব ছিল গদাধরের। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বেড়াতে, মুক্ত হাওয়ায় ছুটোছুটি করতে, গাছের তলায় ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকতে সে যেন বড়ই ভালোবাসতো। পাখির গান শুনলে তার ভাব হ'তো, জলভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকলে তার ভাব হ'তো, ফুলের শোভা দেখলে তার ভাব হ'তো।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—"একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মতো বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো! সে এমন এক বাহার হ'লো! দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হ'লো যে, আর হুঁশ রইলো না! প'ড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐ ভাবে প'ড়ে ছিলাম, বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ি নিয়ে এসেছিল।"

গদাধরের একটা গুণ ছিল। ভালো গান গাইতে পারতো সে। ভারি সুন্দর গলা ছিল তার। গান গাইতে গাইতেও মাঝে মাঝে সে বেহুঁশ হ'য়ে যেত। ঠাকুরদেবতার মন্দিরে গেলেও মাঝে মাঝে তার অমনি ভাব হতো। দেখেশুনে মা-বাপের দুর্ভাবনার অন্ত থাকতো না। কিন্তু, জ্ঞান হ'লে ছেলে বলতো—কই, আমার তো কিছু হয়নি,—এতক্ষণ তো বেশ আনন্দের মধ্যেই ছিলুম। পাড়া-প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলতেন —এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়, বড় হ'য়ে এ-ছেলে অসাধারণ মানুষে পরিণত হবে।

॥ তিন ॥

গদাধর যখন বছর সাতেকের, তখন ক্ষুদিরাম হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গিয়েছিলেন ভাগ্‌নে রামচাঁদের বাড়ি, সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের লোকেরা যখন নদীতে প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছে বিসর্জন দিতে, ঠিক সেই সময় রামচাঁদের বাড়িতে কান্নার রোল উঠ্‌লো—ক্ষুদিরাম শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

খবরটা যখন কামারপুকুরে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন সারা গ্রাম জুড়েই যেন শোকের ছায়া নেমে এলো। চঞ্চল গদাধর দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মতো, তারপর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। গদাধরের চোখের জল তবু কি বাধ মানে।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর থেকে গদাধর আর পাঠশালায় যায় না। হয় বাড়িতে ব'সে থাকে চুপটি ক'রে, নয়তো একলা একলা ঘুরে বেড়ায় মাঠে-মাঠে, নদীর ধারে, ঝোপে-ঝাড়ে, শ্মশানে।

এমনি ক'রে কাট্‌লো বেশ কিছুদিন।

ঠাকুর-দেবতার প্রতি গদাধরের ভক্তি ছিল খুব।

গাঁয়ে-ঘরে সেকালে তো বার মাসে তের পার্বণ লেগেই ছিল। পূজামণ্ডপে সকলের আগে গদাধরের যাওয়া চাই তাছাড়া, যাত্রা, কথকতা, কীর্তনের আসরেও তাকে দেখতে পেত সবাই। আগেই বলেছি, গদাধর লেখাপড়া বেশি না শিখলেও তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যাত্রাগান দেখতে দেখতে গোটা পালা-ই তার মুখস্থ হ'য়ে যেত। পরে, গাঁয়ের সমবয়সী ছেলেদের জড়ো ক'রে গদাধর সেই পালারই পুনরভিনয় করতো। হয়তো কৃষ্ণলীলা হ'চ্ছ—তাতে গদাধর সাজে কৃষ্ণ, কেউ বা শ্রীদাম, সুদাম, কেউ বা রাধা। এমনি ক'রে বালক গদাধর কৃষ্ণলীলা, রামলীলা প্রভৃতি অনেক যাত্রা-র পালাই পুনরভিনয় করেছে। সেই সব দেখতে পাড়ার ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সবাই এসে জড়ো হ'তো। ছেলেখেলা হ'লেও, গদাধরের অভিনয় দেখে আর তার গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে যেত।

গদাধরদের বাড়ির কাছাকাছি ছিল একটা আমবাগান। সেই আমবাগানেই হ'তো যতো ছেলেখেলা, গান আর যাত্রার পুনরভিনয়। আর একটা খেলা ছিল গদাধরের খুব প্রিয়। তা হ'লো পূজো-পূজো খেলা। বিভিন্ন পূজার সময় গদাধর দেখতো

কুমোরেরা কেমন ক'রে দেবদেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়ে। দেখে দেখে সেও শিখে ফেল্‌লো মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার কৌশলটা। তারপর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে আমবাগানে ব'সে সে-ও মূর্তি গ'ড়তে শুরু করলো। কখনো শিবের মূর্তি, কখনো কালীর, কখনো বা রাধাকৃষ্ণের। চমৎকার হ'তো সেই সব মূর্তি। ঠিক যেন নিপুণ কারিগরের হাতে তৈরি। সেই সব ঠাকুর গড়িয়ে পূজো করতো বালক গদাধর আর তার সঙ্গী-সাথীরা।

এ থেকেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মনে ধর্মভাব জেগেছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই।

গদাধরের বয়স যখন তের কি চোদ্দ, সে-সময় ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। শিবরাত্রির উৎসব। গাঁয়ের এক বাড়িতে শিবের পালা যাত্রা হবে। কিন্তু যে লোকটির শিব সাজবার কথা ছিল, তার হঠাৎ অসুখ হ'য়ে পড়লো। কর্মকর্তারা তো মাথায় হাত দিলেন। শিব ছাড়া তো আর শিবের যাত্রা হয় না! তখন কে একজন বল্‌লে—গদাই থাকতে আবার ভাবনা! ডাকো ওকে। ওতো খাশা অভিনয় করে। ও-ই সাজবে শিব। গদাইকে ডাকা হ'লো। সে তো এক কথাতেই রাজি।

সন্ধ্যাবেলায় যাত্রার আসর বসলো বিরাট সামিয়ানার নিচে। শিব সেজে গদাই নামলো আসরে। অভিনয় করতে করতে হঠাৎ একসময় গদাই ভাবে বিভোর হ'য়ে গেল। দেখে মনে হ'লো স্বয়ং শিব যেন ধ্যানে ব'সে আছেন। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। ওদিকে শিবরূপী কিশোর গদাধরের ধ্যানগম্ভীর মুখে

ফুটে উঠেছে দিব্যজ্যোতি। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁট দু'টি কাঁপছে থর্‌থর্ ক'রে।

বন্ধ হ'য়ে গেল যাত্রা। অচৈতন্য অবস্থায় লোকজনেরা গদাইকে বাড়ি পৌঁছে দিল। চেতনা ফিরে আসতে নাকি সেদিন অনেক সময় লেগেছিল।

ছেলের এমনধারা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে মায়ের মন তো সব সময় অস্থির। শেষটায় ছেলেটা কি বাড়িঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে।

ঠাকুর-দেবতার ব্যাপারে গদাধর গুরুগম্ভীর হ'লেও, অন্য সময় সে ছিল হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয়। হাসি ও মজার কথা ব'লে সে সবাইকে খুব হাসাতে পারতো। গুরুমশাই কেমন ক'রে পড়ান, কথক ঠাকুর কিভাবে হাত নেড়ে, মুখ বাঁকিয়ে কথা বলেন, যাত্রায় সং কেমন ক'রে অভিনয় করে, গদাধর সবকিছু হুবহু নকল ক'রে দেখাতে পারতো। তার উচ্চারণ যেমন ছিল স্পষ্ট, তার কণ্ঠও ছিল তেমনি মধুর।

গুরুমশাই অনেক চেষ্টা করেছিলেন গদাধরের লেখাপড়ার জন্য। কিন্তু সে বলতো—'বিদ্যে শিখে কী হবে ? হবে এই যে, বাড়ি বাড়ি শ্রাদ্ধ করাতে হবে, আর চালকলা বেঁধে আনতে হবে। আবার সেই অন্ন খেতে হবে। আমার অমন বিদ্যেয় কাজ নেই।'

॥ চার ॥

তোমরা শুনে থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে জাত-বিচারের বালাই ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তিনি জাতবিচার মানতেন না।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছেই ছিল এক কামারের মেয়ে। ধনী কামারনী ব'লেই পরিচয় ছিল তার। গদাই-র যখন জন্ম হয়, তখন এই কামারনীই আঁতুড় ঘরে মা ও ছেলের দেখাশোনা করে। তারপর থেকে তার কোলে-পিঠে চ'ড়েই গদাই বড় হয়। গদাইকে বড় ভালোবাসতো ধনী। সে তাকে নিজের হাতে খাওয়াতো-পরাতো, কোলে-পিঠে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যেত। গদাই তাকে ডাকতো মা ব'লে। মা-ডাক শুনে গরিব কামারের মেয়ে ধনীর বুক যেন আনন্দে ভ'রে যেত।

গদাই প্রায়ই ধনীর কুঁড়েঘরে গিয়ে হাজির হ'তো, তার হাতের রান্না পর্যন্ত খেত। ধনী যদি বলতো—কি সর্বনাশ! তুই বামুনের ছেলে। আমি শুদ্দুরের মেয়ে। আমার রান্না খাবার খেলে তোর জাত যাবে যে!—তাহ'লে গদাই আরও বেশি ক'রে খেত। বলতো—মার রান্না খেলে কি ছেলের কখনও জাত যায় রে! কথা শুনে ধনীর দু'চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু পড়তো গড়িয়ে। সে ভাবতো—এ কি কোনো মানুষের ছেলে, না শাপভ্রষ্ট কোনো দেবকুমার!

ধনী কামারনীকে নিয়ে সুন্দর একটা গল্প আছে।

গদাই-র তখনও পৈতে হয়নি। ধনী একদিন গদাইকে কাছে ডেকে বল্‌লে তোর যখন পৈতে হবে তখন আমি তোর ভিক্ষা-মা হব। আমার হাত থেকে তুই কি ভিক্ষা নিবি না? গদাই হেসে বল্‌লে—বাঃ, কেন নেব না? আমার পৈতে যখন হবে, তখন তোমাকেই ভিক্ষা-মা করব। এদের দু'জনের এই কথাবার্তার কথা কিন্তু আর কেউ জানলো না। তারপর সত্যি সত্যি যখন পৈতের সময় হ'লো, তখন গদাই বাড়ির সকলকে বল্‌লে—ধনীমাকে কিন্তু ভিক্ষা-মা করতে হবে। কথা শুনে বাড়ির সবাই তো অবাক্! বড়ভাই রামকুমার বল্‌লেন—তা কেমন ক'রে হয়? ধনী হলো শূদ্রের মেয়ে। তার হাত থেকে কি ব্রাহ্মণের ছেলে ভিক্ষা নিতে পারে কখনও? মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসনপরিহিত বালক গদাধর কিন্তু অচল অটল। সে বল্‌লে—কিন্তু আমি যে ধনী-মাকে কথা দিয়েছি। তার হাত থেকে ছাড়া আমি আর কারও হাত থেকে ভিক্ষা নিতে পারব না। শেষ পর্যন্ত গদাধরের কথাই রইলো। উপনয়নের বেশে বালক গদাধর কামারের মেয়ে ধনীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ালো। বল্‌লে—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি!' ধনী কামারনীর মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। এমন সৌভাগ্য যে তার কোনোদিন হবে, সে কি তা স্বপ্নেও ভেবেছিল। পরিহাসছলে যে-কথা গদাইকে সে একদিন বলেছিল, শেষকালে তাই যে সত্যি হ'তে চল্‌লো। এ আনন্দ ধ'রে রাখবে সে কেমন ক'রে। আনন্দে পুলকিত হ'য়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ধনী তখন গদাই-র ছোট্ট হাত দু'খানি ভ'রে ভিক্ষে দিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলাকার বহু বিচিত্র গল্প আছে এমনিতর। আর একটি গল্প বলি এইখানে।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তখনও বেঁচে। বাড়িতে তিনি পূজা করেন বিগ্রহ রঘুবীরের। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের। রোজ ভোরে উঠে ফুল তোলেন, মালা গেঁথে ঠাকুরের গলায় পরান। তারপর ফলমূল নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজায় বসেন। চোখ বুজে ধ্যান করেন। একদিন সেইরকম ধ্যান করছেন। ওদিকে বালক গদাধর চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ঠাকুরের জন্য সাজানো নৈবেদ্য থেকে ফলমূল তুলে নিয়ে মুখে পুরেছে। তারপর ঠাকুরের গলা থেকে মালা খুলে নিজের গলায় প'রে ঠাকুরকে কোলে নিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে ব'সে আছে। ক্ষুদিরাম তো চোখ খুলেই অবাক! ছেলে তখন মিটিমিটি হাসছে আর বল্‌ছে—'ওগো দেখনা, মালা প'রে কেমন সেজেছি, একবার চেয়ে দেখ না!' ক্ষুদিরাম কিন্তু ছেলেকে কিছু বল্‌লেন না। মনে মনে হয়তো ভাবলেন—এসবই ভগবানের খেলা!

শ্রীরামকৃষ্ণের শৈশব-জীবনের এই সব কাণ্ডকারখানা নেহাৎ-ই কি ছেলেমানুষি!

॥ পাঁচ ॥

গাঁয়ে থেকে গদাধরের লেখাপড়া মোটেই হচ্ছে না দেখে, বড়ভাই রামকুমার মায়ের কাছে প্রস্তাব করলেন গদাইকে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবেন। মা বল্‌লেন—সে তো ভালো কথা। তাই কর বাছা তাই কর। এখানে তো দিনরাত্তির লাহাদের ধর্মশালায় গিয়ে সাধু-সন্নিসীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে—কোন্‌দিন না তারা আবার ওকে ঘরছাড়া করে। চন্দ্রাদেবীর খালি ভয়, ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

শুভদিনে গদাধর দাদা রামকুমারের সঙ্গে ক'লকাতায় চল্‌লেন। সেখানে দাদা এক টোল খুলেছেন। সংস্কৃত পড়ান ছাত্রদের—আর, গৃহস্থ-বাড়িতে গিয়ে পূজা-অর্চনা ক'রে আসেন। কোনোরকমে চ'লে যায়।

ক'লকাতাতে এসেও কিন্তু গদাধরের মতিগতি ফিরলো না।

লেখাপড়ায় মন নেই এতটুকু। রামকুমারের ফাইফরমাস খাটে, নয়তো গৃহস্থ-বাড়ি থেকে পূজোর পর চালকলা বেঁধে আনে। মাঝে মাঝে আবার রাস্তাতেই গরিব ভিখিরিদের সেই চালকলা বিলিয়ে দেয়।

রামকুমার মাঝে মাঝে ভারি বিরক্ত হন। একদিন স্পষ্টই তিনি লেখাপড়া না করার জন্য গদাধরকে গালমন্দ করলেন। গদাধর কিন্তু নির্বিকার। সে বল্‌লে—পুরুত হবার বিদ্যে শিখতে চাইনে আমি। আমি চাই সত্যিকারের জ্ঞানলাভ করতে। পার তা শেখাতে?

কথা শুনে কী বলবেন রামকুমার! তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

এইভাবে তিন তিনটে বছর কেটে গেল।

মাঝে দু'একবার কামারপুকুর থেকে ঘুরেও এলেন দু'ভাই।

হঠাৎ একদিন গদাধরের জীবনে মহা-পরিবর্তন এলো। সেই পরিবর্তনেই যুবক গদাধর ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণে পরিণত হলেন।

কলকাতার মাইল ছয়েক উত্তরে পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। বড় সুন্দর জায়গা। একেবারে গঙ্গার ধারেই। সেখানে যদি কখনও যাও তাহ'লে দেখবে দক্ষিণেশ্বরী কালিকার বিরাট্ মন্দির। সেই মন্দিরের পাশেই আর একটি মন্দিরে রয়েছেন রাধাশ্যাম, আর বারটি শিবের মন্দির রয়েছে গঙ্গার ধার ঘেঁষে। তাছাড়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নাটমন্দির, পঞ্চবটী, নহবতখানা।

পুণ্যশীলা রানী রাসমণি এই সব মন্দির করান। দেশের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ ক'রে গেছেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তাঁর সকল কীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

২৪-পরগনা জেলার হালিসহরের কাছাকাছি কোনো গ্রামে রাসমণির জন্ম। তাঁর বাবা হরেকৃষ্ণ দাস ছিলেন সাধারণ এক কৃষক-মানুষ। চাষবাস আর ঘরামির কাজ ক'রেই কোনোরকমে তিনি সংসার চালাতেন। ঘটনাচক্রে এগার বছর পূর্ণ হ'তে-না হ'তেই তাঁর মেয়ে রাসমণির বিয়ে হ'য়ে গেল কলকাতার জানবাজারের এক নামকরা ধনী ব্যবসায়ী প্রীতরামের ছেলে রাজকুমার দাসের সঙ্গে। প্রীতরাম ধানচালের ব্যবসায় ক'রে বিস্তর টাকা রোজগার করেছিলেন। তাছাড়া বহু জমিজমার মালিকও ছিলেন

তিনি। আর পুত্রবধূরূপে রাসমণি যেদিন তাঁর সংসারে পা দিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর ধনদৌলত চতুর্গুণ হ'য়ে উঠ্‌লো। কাজেই, রাসমণি দাস-পরিবারের লক্ষ্মীস্বরূপারূপে সকলের আদরণীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর রানী রাসমণিই হ'লেন প্রীতরাম-রাজচন্দ্রের বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। তাই অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বিরাট্ জমিদারীর সমস্ত দায়িত্বভার বহন করেছিলেন তিনি।

গরিবের কাছে রানী রাসমণি যেন ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তাঁর দরজা থেকে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে যায়নি। দীনদুঃখীর সেবায় আর বহু জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন রাসমণি। তাঁর মতো দানশীলা ও পুণ্যবতী রমণী এ-যুগে বিরল। ১২৪০-সালের মহা-দুর্ভিক্ষে তিনি যেভাবে হাজার হাজার লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে-ছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। ভারতবর্ষের বহু তীর্থেই রানী রাসমণির দানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে।

রাসমণির কর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির নির্মাণ। স্বপ্নে তিনি নাকি একদিন এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তির কাছে আদেশ পান—গঙ্গার তীরে আদ্যাশক্তি কালীমূর্তি, যুগল রাধাশ্যাম আর বারটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য। সেই স্বপ্নাদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে তাঁরই অর্থব্যয়ে গ'ড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের তিনটি প্রধান শাখার তিনরকম মন্দির—শাক্ত-ধর্মের দেবী

কালিকার মন্দির, শৈব-ধর্মের দেবতা শিবের মন্দির আর, বৈষ্ণব-ধর্মের বিগ্রহ রাধাশ্যামের মন্দির।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণেশ্বরী কালিকার পূজার জন্য রাসমণি অনেক খুঁজে পেতে গদাধরের দাদা রামকুমারকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধরও সেই সঙ্গে দাদার কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রইলেন। গদাধরের বয়স তখন বছর কুড়ি।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনই গদাধর এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। দেখলেন খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুম। হাজার হাজার লোক খাচ্ছে মন্দিরের উঠোনে ব'সে। বিস্তর আয়োজন। দেখেশুনে গদাধরের মনটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠ্‌লো। তিনি ভাবলেন এ-সবই হচ্ছে রানী রাসমণির টাকার অহঙ্কার। তিনি তাই না খেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন—আর, মাঝে মাঝে মা-কালীর স্তবগান করতে লাগলেন।

সেই গানের সুর ভেসে গেল রানী রাসমণির কানে। তিনি তখনও কিছু খাননি। সকলের খাওয়া না-হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু খাবেন না। গদাধরের গান শুনে তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ধ'রে আনতে। আত্মভোলা গদাধর কাছে এসে দাঁড়ালেন। রানী খানিকক্ষণ অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তাঁর সর্বশরীরে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। তারপর গদাধরকে খাইয়ে তবে নিজে খেলেন। রানী তখনও পর্যন্ত অভুক্ত আছেন জেনে গদাধরের যেন চমক্ ভাঙলো। তিনি দেখলেন, বিষয়ী হলেও রানীর মনে ভক্তি আছে। তাই তিনি আর খেতে কোনো আপত্তি করলেন না।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে গদাধরের আনন্দের সীমা নেই। কেমন নির্জন গঙ্গাতীর, কেমন সব গাছপালা, কেমন সুন্দর মন্দির আর কেমন বিগ্রহ। গদাধর আপন মনে ঘুরে বেড়ান আর ঠাকুর-দেবতার গান করেন। কখনও বা নির্জন নদীতীরে ব'সে ধ্যান করেন।

প্রথম প্রথম মন্দিরের জাঁকজমক দেখে তাঁর খুব খারাপ লেগেছিল। রাসমণির কর্মচারীদের কাছ থেকেও দূরে দূরে থাকতেন তিনি। জাঁকজমক, টাকাকড়িকে তিনি প্রথম থেকেই বড় ভয় করতেন। বল্‌তেন—ওতে লোভ আসে, মনে অশান্তি জাগে। লোভ-মোহ থেকে যত দূরে দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। বিষয়-বাসনা থেকে মুক্তি পেলে মানুষ যে পরম শান্তি লাভ করতে পারে এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁর হয়েছিল আপনা থেকেই, কেউ তাঁকে এ-কথা কোনদিন শেখায়নি, কোনো বই প'ড়েও এ-কথা তিনি জানেন নি।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের দেখাশোনা করতেন রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবু—মথুরনাথ বিশ্বাস। বড় ভালো লোক তিনি। যেমনি উদারপ্রকৃতির, তেমনি মহৎপ্রাণ। রাসমণির কোনো ছেলে ছিল না, তিনিই ছিলেন তাঁর ছেলের মতো।

তিনি একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, রামকুমারের পাগ্‌লাটে ভাইটি ভাবে বিভোর হ'য়ে শিবপূজা করছেন। সামনেই একটি শিবমূর্তি। সঙ্গে ছিলেন রামকুমার-গদাধরের ভাগ্‌নে হৃদয়রাম। তিনিই মথুরবাবুকে বল্‌লেন যে, ও-শিবমূর্তি ছোটমামা নিজেই গড়েছেন।

মথুরবাবু তো অবাক্। এমন নিখুঁত মূর্তি তিনি আর কখনও দেখেননি। গদাধর পাগ্‌লাটে হলেও তাঁকে বড় ভালো লেগেছিল মথুরবাবুর। তাঁর চেহারার বিশেষত্ব, তাঁর হাবভাব, ধনদৌলতের প্রতি তাঁর বিরক্তি, তাঁর সুমধুর কণ্ঠ মথুরবাবুকে বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি একদিন তাই রাসমণিকে বল্‌লেন—পুরোহিত রামকুমারের ভাই গদাধরকে রাধাশ্যামের পূজার ভার দিলে কেমন হয় মা? ওঁর ভক্তি অসাধারণ। আমার বড় ভালো লেগেছে ওঁকে।

॥ ছয় ॥

মথুরবাবু মাঝে মাঝে এসে লক্ষ্য ক'রে যান রামকৃষ্ণ কেমন ক'রে রাধাশ্যামের পূজা করেন। অমন ভক্তি তিনি আর দেখেননি। রানী রাসমণিও লক্ষ্য করেন তা।

রাসমণির ইচ্ছা রামকৃষ্ণ এবার কালীপূজার ভারও গ্রহণ করুন। কারণ, রামকুমারের তখন বেশ বয়স হয়েছে—একা সবদিক সামলে উঠ্‌তে পারেন না। তারপর, বিশেষ ব্যাপারে তিনি একদিন দেশে গিয়ে শক্ত অসুখে পড়লেন। তারপর মারাও গেলেন সেখানে। তাই, কালীপূজার ভার যদি রামকৃষ্ণ গ্রহণ না করেন তো, তাঁর মতো নিষ্ঠাবান ভক্ত পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর।

বড়দাদার মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মনে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ, বলতে গেলে তিনি তো দাদার কাছেই মানুষ। কিন্তু

একুশ বছরের রামকৃষ্ণ সব শোক জয় ক'রে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সেবায় ডুবে রইলেন। রাসমণির ও মথুরবাবুর আগ্রহে মা কালীর পূজার ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। রাধাশ্যামের পূজার জন্য নিযুক্ত হলেন অন্য পুরোহিত।

সাধারণতঃ যে-সব নিয়ম-কানুন মেনে পূজা হয়, রামকৃষ্ণ সেই সব নিয়ম-কানুন মেনে পূজা করেননি কোনোদিন। তিনি বলতেন, 'আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে। শাস্ত্রের বিধান মতো পূজা করব কি ক'রে!' অবশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র তিনি জানতেন না, ও-কথাটা ঠিক নয়। আর শাস্ত্রের বিধানও তিনি জানতেন ভালো ক'রেই। কিন্তু, পূজা করতে ব'সে তাঁর সময়ের হুঁশ থাকতো না, নিময়-কানুনেরও ব্যতিক্রম ঘটতো। পূজা করছেন তো করছেনই, আরতি করছেন তো আর শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐভাবে চ'লে যেত। একেবারে বিভোর হ'য়ে যেতেন। তাঁর যেন কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। দেবতার পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতেন তিনি। ভাবাবেগে 'মা' 'মা' করছেন, দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। কখনও তা আনন্দের, কখনও বা বেদনার। তিনি যে মায়ের পূজা করতেন তা নিছক ফুল-বেলপাতা দিয়ে আর গুটিকয়েক সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে নয়—অন্তরের সমস্ত ভক্তিরস ঢেলে মা-কালীর পূজা করতেন রামকৃষ্ণ।

আগেই বলেছি, ছেলেবেলা থেকে ভালো গাইতে পারতেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরে তিনি যেদিন থেকে মা-কালীর পূজায় বহাল হন, সেদিন থেকে রোজ মন্দিরে ব'সে বিভোর হ'য়ে গান

শোনাতেন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। মা কালী হলেন জগন্মাতা, জগজ্জননী তিনি। রামকৃষ্ণ তাঁর সেবক। নিজের যা-কিছু ভালো-লাগার জিনিস তা সবই মায়ের কাছে অর্পণ করতে না পারলে যেন তার মনে কোনো শান্তি নেই। তাইতো, গানের মালায় পূজা করতেন তিনি মা কালীকে। যাঁরা তাঁর মুখের ভক্তি-সঙ্গীতগুলি শোনবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এ-কথা স্বীকার ক'রে গেছেন যে, রামকৃষ্ণের গানের কোনো তুলনা নেই। অন্তর থেকে যেন আপনিই সে-সব গানের জন্ম হ'তো। প্রবল ভক্তি ও দেবানুরাগ না থাকলে অমন সুমধুর গান গাওয়া সম্ভবপর নয়। তাঁর গান শুনে অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিহ্বল হ'য়ে পড়তো।

রামকৃষ্ণের গান বা কালী-কীর্তন—সে হ'লো বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরে। তাল-মানের বিচার নেই, ওস্তাদী নেই কোথাও —অথচ, সে-গান শুনলে সারা মন নেচে ওঠে, দু'লে ওঠে।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত তাঁরাই বলেন—ভক্তি থাকলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। এ বড় খাঁটি কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলতেন—'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহু দূর।' শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন সেই সহজ পথের মানুষ। তিনি সহজ সরল মনে দিনরাত আকুল হ'য়ে ভগবানের দর্শন কামনা করেছিলেন মা-কালীর মধ্য দিয়ে, তাই বোধকরি তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

ভগবানকে ভক্তেরা নানাভাবে ডেকে থাকেন। কেউ তাঁকে ডাকেন প্রভু ব'লে, কেউ ডাকেন মা ব'লে, কেউ বা

ডাকেন সখা ব'লে। ডাকার মতো ডাক যদি হয় তাহ'লে ভগবান সব রূপেই ভক্তের কাছে ধরা দেন। শ্রীচৈতন্য ডেকেছিলেন প্রভু ব'লে, রামকৃষ্ণ ডেকেছিলেন মা ব'লে, ভক্ত-সুদামা ডেকেছিলেন সখা বা বন্ধু ব'লে। তাঁরা তো সকলেই ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ মা-কালীকে পূজা করতেন যেন নিজের মা ব'লে। মায়ের কাছে তাই তাঁর যত মান-অভিমান। নিজের হাতে মা-কে খাওয়াচ্ছেন, সাজাচ্ছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন গান গেয়ে। মায়ের সাজ সুন্দর হ'লে তাঁর যেন আর আনন্দ ধরে না। দু'হাত তুলে নাচেন আর বলেন—ওরে তোরা দেখে যা, মা আমার কেমন গয়না-গাঁটি প'রে সেজেছেন, কেমন হাসছেন দেখ, দেখ। সাধারণ লোকে অত-শত বুঝতো না। তারা ভাবত ঠাকুরের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তাই অমন করছেন। পাথরের ঠাকুর, তিনি কি আবার হাসেন নাকি!

কিন্তু, মথুরবাবু, রানী রাসমণি এবং আরও দু'চারজন ভক্ত ব্রাহ্মণেরা অপলক নয়নে চেয়ে থাকতেন রামকৃষ্ণের মুখের দিকে। তাঁরা বুঝতেন, কতখানি বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে মানুষ অমন ক'রে বলতে পারে। দিন দিন রামকৃষ্ণের প্রতি তাই তাঁদের শ্রদ্ধাও বেড়ে চল্‌লো।

সকাল থেকে রাত অবধি রামকৃষ্ণ প'ড়ে থাকেন মায়ের মন্দিরে। মায়ের সাজ-সজ্জা সব করেন নিজের হাতে। তাঁর পূজা, ভোগ, আরতি, শয়ান—কাজের যেন আর বিরাম নেই। মাঝে মাঝে আপন মনে মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন,

কাঁদেন, নৃত্য করেন। কিন্তু তখনও তিনি মায়ের সাক্ষাৎ-রূপ দর্শন করেননি। তাইতো অত আকুলি-বিকুলি। কি ক'রলে মা খুশি হবেন, কেমন ক'রলে তাঁকে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে দর্শন করতে পারবেন—এই চিন্তায় তাঁর মন দিনরাত ছট্‌ফট্ করতে থাকে। আহার-নিদ্রা সব বন্ধ। দেবীর সামনে ব'সে কেবল ঐ এক কথা—দেখা দে মা, দেখা দে।

কিন্তু তবু মা দেখা দেন না।

ভক্তকে বোধহয় পরীক্ষা করেন জগজ্জননী মা-কালী।

এমনি করেই কেটে যায় বেশ কিছুদিন।

শেষটায় একদিন ধৈর্য হারিয়ে রামকৃষ্ণ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন—'এতো সেধেও পাষাণী যখন দেখা দিলি না, তখন আর আমার বেঁচে কি হবে। ওই তো রয়েছে মায়ের হাতে খড়্গ। ওই খড়্গ আজ নিজের গলায় দোব।' এই না ব'লে তিনি লাফ দিয়ে মা-কালীর হাতের খড়্গ ধরতে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক কাণ্ড। সমস্ত ঘর যেন আলোয় আলো হ'য়ে গেল। রামকৃষ্ণের মনে হ'লো ঘরদোর, মন্দির লোকজন সব কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতির সমুদ্রে—চারিদিকে শুধু আলো আর আলো। সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে জগজ্জননী মা কালী—তিনি আশীর্বাদ করছেন তাঁর ভক্ত রামকৃষ্ণকে। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো মা-কালীর কাছ থেকে ছুটে এসে রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অচৈতন্য হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন 'মা' 'মা' ব'লে।

দু'দিন পর্যন্ত তিনি প্রায় একই অবস্থায় রইলেন। যখন তাঁর জ্ঞান হ'লো, তখন মনে হ'লো এতক্ষণ ধরে তিনি যেন এক আনন্দ-জগতে ছিলেন। সেখানে শুধু আনন্দ আর শান্তি, সুখ আর পরিতৃপ্তি। রামকৃষ্ণের সাধনা যেন এতদিন পরে সার্থক হ'লো, মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ দর্শন ক'রে তিনি ধন্য হলেন।

॥ সাত ॥

এই ঘটনার পর থেকে রামকৃষ্ণ যেন সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেলেন। দিনরাত মন্দিরে প'ড়ে থাকেন, আর 'মা দেখা দে' ব'লে মা-কালীকে ডাকেন। মা-কালীর যে জ্যোতির্ময়ী রূপ তিনি একবার দেখেছেন, সেই রূপ বারবার ক'রে দেখবার জন্য তাঁর মন ছট্‌ফট্ করে। 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদেন ঠাকুর, 'মা' 'মা' ব'লে অচৈতন্য হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মা-কালীর সামনে। মন্দিরে ভিড় জমে যায়। কেউ বলে—ঠাকুরের দশা হয়েছে, ভাবে ধরেছে ঠাকুরকে। কেউ বলে ও-সব যত চালাকি, বুজরুকি। তাদের কথায় কান দেন না রামকৃষ্ণ—হয়তো শুনতেও পান না বাইরের লোকের কথা। তিনি পূজা ক'রে চলেন, 'মা' ব'লে গান ধরেন, মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। সেই অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর মনে হয়, মা যেন আবার জ্যোতির্ময়ী রূপ ধ'রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তাঁকে আশার বাণী শোনাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কখনও দেখেন জ্যোতির্ময়ী সেই মাতৃমূর্তির চোখের কোণায় জল, কখনও বা তাঁর মুখের কোণে হাসি।

মা-কালীর পায়ে অন্তরের সমস্ত ভক্তি ঢেলে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সহজ সরল মন দিয়ে মায়ের পূজা করেন তিনি।

কিন্তু তাঁর পূজার ধরণ-ধারণ দেখে সাধারণ লোক তো তাঁকে 'পাগ্‌লা ঠাকুর' আখ্যা দিয়েছে। সেদিকে কোনো হুঁশ্‌ নেই তাঁর।

যাঁকে তিনি 'মা' ব'লে ডাকেন, সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ছেলের মতই। শাস্ত্রের বিধান ছেড়ে তিনি মানুষের সহজাত বিধানেই মায়ের সেবা করতে লাগলেন।

একদিন ঠাকুর বসেছেন মায়ের ভোগ দিতে। থালায় থালায় অন্ন-ব্যঞ্জন-ভোগ। মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুর বল্‌লেন—মা ভোগ দিয়েছি, এবারে তুই খা। কিন্তু পাথরের মা-কালী যেমন দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনি দাঁড়িয়েই আছেন। ভোগের থালায় ভোগ রয়েছে প'ড়ে। যেমন থাকে আর কি! কিন্তু ভাবসিদ্ধ ঠাকুর সে-কথা শুনতে নারাজ। পাথরে-গড়া মূর্তি হ'লেও দেবী তো তারই মধ্যে রয়েছেন, তবে তিনি কেন ভক্তের নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করবেন না।

তিনি ভাবলেন, ছেলে অভুক্ত আছে ব'লেই বোধ হয় মা খেতে চাইছেন না। তিনি তাই ভোগের থালা হাতে ক'রে মায়ের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—কি হ'লো তোর? আমি না খেলে তুই খাবি না? বেশ, আমি খাচ্ছি। এই ব'লে ঠাকুর এক গ্রাস ভাত খেয়ে এক গ্রাস মায়ের মুখের কাছে ধরেন।

কেউ কেউ জানালা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে, আর বাইরে গিয়ে ব'লে বেড়ায়—রামকেষ্ট একেবারে পাগল হ'য়ে গিয়েছে।

পূজায় ব'সে রামকৃষ্ণ এক একদিন এক এক কাণ্ড ক'রে বসেন।

পূজার জন্য ফুল-বেলপাতা রয়েছে তামার টাটে। ঠাকুর পূজায় ব'সে করলেন কি, প্রথমে নিজের মাথায়, বুকে, পায়ে সেই ফুল-বেলপাতা ছুঁইয়ে তারপর তা' দিলেন মায়ের পায়ে।

কখনো আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে মায়ের সিংহাসনে বসে মাকে আদর করেন, হাসি, তামাসা, গল্প করেন পর্যন্ত। কখনো আবার মা-কালীর হাত ধ'রে আনন্দে নেচে ওঠেন, গান করেন। কোনদিন আবার রাত্রে মা-কালীর শয়ানী দিতে গিয়ে নিজেই মায়ের খাটে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকেন।

রামকৃষ্ণের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে মন্দিরের আর সবাই স্থির থাকতে পারেন না। তাঁরা গিয়ে খবর দেন মথুরবাবুকে, রানী রাসমণিকে।

মথুরবাবু একদিন সকলের অগোচরে মন্দিরে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর তখন পূজায় বসেছেন আর ব'লে চলেছেন—"মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও

তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও—শুদ্ধা ভক্তি দাও।”

ঠাকুরকে এইভাবে পূজা করতে দেখে ও তাঁর মুখের কথা শুনে মথুরবাবুর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা নেই। এই তো ভক্তি, এই তো আসল পূজা। কত বড় ভক্ত ও সাধক হ'লেই না এইভাবে পূজা করতে পারে, সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারে মায়ের পায়ে। মথুরবাবু দেখলেন, ভক্তিভরে ঠাকুর ধ্যানস্থ হ'য়ে আছেন, আর তাঁর সারা শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের মধ্যে। তিনি তখন মা-কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার ক'রে মন্দির ছেড়ে চ'লে এলেন। আর, সকলকে ব'লে গেলেন, কেউ যেন ঠাকুরের পূজা করবার পদ্ধতি নিয়ে তর্ক না করে। ঠাকুরের যেমন ইচ্ছে, তেমনি ক'রেই তিনি মা-কালীর পূজা করুন।

মথুরবাবুর মুখে সব কথা শুনে রানী রাসমণিরও একদিন ইচ্ছে হ'লো মন্দিরে এসে ঠাকুরের পূজা-করা দেখেন। তিনিও বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন রামকৃষ্ণকে।

আরতির শেষে ঠাকুর কালী-কীর্তন ধরেছেন। ভাবে বিভোর হ'য়ে গান গেয়ে চলেছেন একটার পর একটা। কে আসছে, কে যাচ্ছে কোনদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই নেই। রাসমণিও এসে বসেছেন মন্দিরের দোর-গোড়ায়। ঠাকুরের গান শুনছেন এক মনে।

হঠাৎ ঠাকুরের নজর পড়লো রাসমণির দিকে।

রাসমণি চোখ বুজে বসেছিলেন। একমনে গান শুনছিলেন ঠাকুরের। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা মোকদ্দমার কথাও মনে হচ্ছিল তাঁর।

রানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ যেন তাঁর মনের কথা টের পেলেন। বিরক্ত হ'য়ে তিনি রাসমণিকে একটা চড় মেরে বল্‌লেন—'কি, এখানেও ঐ বিষয়-চিন্তা!'

বিস্ময়ের সীমা রইলো না রানী রাসমণির। রামকৃষ্ণ তাঁর মনের কথা টের পেলেন কেমন ক'রে? তিনি কি তবে অন্তর্যামী! মানুষের মনের কথা সবই বুঝতে পারেন তিনি!

রানীর গায়ে হাত তোলায় হুলস্থূল কাণ্ড তখন। যে-যেখানে ছিল সবাই এলো ছুটে। পাগ্‌লা ঠাকুরের বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি! মারমুখী লোকজন দেখে রামকৃষ্ণ তো ভয়ে জড়সড়!

রাসমণি হাত তুলে সবাইকে নিরস্ত করলেন। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে চ'লে এলেন মন্দির থেকে। আসবার সময় সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়ে এলেন, কেউ যেন ঠাকুরকে কিছু না বলে।

বাড়ি ফিরে জামাই মথুরমোহনকে খুলে বল্‌লেন সব কথা। বল্‌লেন—'আমি যে মনে মনে মোকদ্দমার কথাই চিন্তা করছিলাম—ঠাকুর কি ক'রে তা টের পেলেন!' কথা শুনে ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

ক্রমশই ঠাকুরের ভাবান্তর হ'তে লাগলো।

মথুরবাবু দেখেশুনে মা-কালীর পূজার অন্য ব্যবস্থা করলেন। আর, রামকৃষ্ণ যাতে সাধন-ভজন করতে পারেন তারও

সুবন্দোবস্ত ক'রে দিলেন তিনি। বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অন্যতম প্রধান সহায়ক হলেন মথুরবাবু।

সেই থেকে রামকৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছামতো ধ্যান করেন, পূজা করেন, ঘুরে বেড়ান, গান করেন। নিজের দিকে তাঁর যেন এতটুকু হুঁশ নেই। খাইয়ে দিলে খান, স্নান করিয়ে দিলে তবে স্নান করেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় ক'রে তিনি কালী-সাধনায় বিভোর। ধ্যানে বসলে তাঁর শরীর যেন পাথর হ'য়ে যায়। কাঁধের ওপর কাক বা চড়ুই পাখি এসে বসলেও তিনি তা টের পান না। মানুষের এ অবস্থা তো সাধারণ নয়।

ধ্যানে বস্‌লে তাঁর মনের যা অবস্থা হ'তো সে-বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন—"উজ্জ্বল জ্যোতিবিন্দু দেখতাম। কখনো দেখতাম, কুয়াশার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চারিদিক ছেয়ে গেছে। কখনো বা দেখতাম উজ্জ্বল জ্যোতির তরঙ্গে সব কিছু ঢেকে ফেলেছে। অনেক সময় চোখ চেয়েও ঐ সব দেখতাম। কি দেখ্‌ছি তা বুঝি না। দেখা ভালো কি মন্দ তাও জানি না। তখন বলতাম—মা, আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না। তোকে ডাকবার মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না। যা করলে তোকে পাওয়া যায়, আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়া আমার সহায় আর কেউ-ই নেই। আমি মান চাইনে, ঐশ্বর্য চাইনে, কিছুই চাইনে, মা! তুই কেবল আমায় দেখা দে।"

এইভাবেই রামকৃষ্ণ এগিয়ে চল্‌লেন সাধনার পথে।

॥ আট ॥

রামকৃষ্ণ যে সাধারণ মানুষ নন্, তিনি যে মহামানব এই সত্য প্রচার করলে একজন সন্ন্যাসিনী।

ঐ সন্ন্যাসিনীর নাম ভৈরবী যোগেশ্বরী।

তাঁর কাছেই দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌লা ঠাকুর রামকৃষ্ণ তন্ত্র-সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মহা-সাধকে পরিণত হলেন।

একদিন সকালবেলায় রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে পূজার ফুল তুলছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর ভাগ্‌নে হৃদয়রামকে বল্‌লেন—দেখ্ ঘাটে একখানা নৌকা ভিড়েছে। এক ভৈরবী এসেছেন তাতে। তাঁকে এখানে নিয়ে আয়।

ছুট্‌লো হৃদয়রাম নদীর ঘাটে। নৌকা থেকে সত্যিই তখন সন্ন্যাসিনী নামছেন। অপূর্ব সুন্দর চেহারা তাঁর। হাতে ত্রিশূল, পরণে গেরুয়া কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের টিপ্। অপূর্ব এক দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সারা চোখে-মুখে।

রামকৃষ্ণের কথা গিয়ে বল্‌তেই ভৈরবী চ'লে এলেন হৃদয়রামের সঙ্গে। ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে দেখেই যেন চম্‌কে উঠলেন সন্ন্যাসিনী। আর খুশি হ'য়ে বল্‌লেন যে তাঁরই খোঁজে তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

কথা শুনে ঠাকুর যেন একটু অবাক্ হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার কথা তুমি জানলে কি ক'রে মা?

—'মায়ের কৃপায় জানতে পেরেছি বাবা।' বল্‌লেন ভৈরবী।

তারপর দু'জনের অনেক কথা হ'লো।

ঠাকুর জানালেন নিজের সব অবস্থার কথা। তিনি মাঝে মাঝে যে-সব অলৌকিক দৃশ্য দেখেন, বেহুঁশ হয়ে যান, তাঁর শরীর যে মাঝে মাঝে আগুনের মতো জ্বালা করে—সব কথাই তিনি খুলে বল্‌লেন যোগেশ্বরীকে। ঠাকুর বল্‌লেন—'আমি কি তবে পাগল হ'য়ে গেলাম মা?' ভৈরবী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন—'কে তোমায় পাগল বলে বাবা? এ-সবই তোমার মহাভাবের লক্ষণ।' বহুদিন ধ'রে একাগ্র মনে ভগবানের চিন্তা করলেই নাকি এই অবস্থা হয়। অনেক মহাপুরুষেরই এই অবস্থা হয়েছে।

যোগেশ্বরী ভৈরবী রামকৃষ্ণকে তন্ত্র-সাধনায় দীক্ষা দিলেন। অসাধারণ বিদুষী ছিলেন এই ভৈরবী। রামকৃষ্ণের ভাষায় যোগেশ্বরী ছিলেন—'চারি বেদ মূর্তিমতী।' বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্র—সব কিছুতেই যোগেশ্বরী ভৈরবীর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

ইনিই দক্ষিণেশ্বরের এক পণ্ডিত-সভায় যুক্তিতর্ক দিয়ে একথা নিশ্চয় ক'রে প্রমাণ করেন যে, রামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, তিনি মহামানব। ঠাকুরের আচার-আচরণ সাধারণ লোকের চোখে পাগ্‌লামি ব'লে মনে হ'লেও আসলে তা মহাভাবেরই প্রকাশ। রামকৃষ্ণ ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ।

এতদিন পরে ঠাকুরের স্বরূপ ধরা পড়লো সকলের কাছে। সকলেই তাঁকে এবার থেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে লাগলেন।

সবচেয়ে আনন্দ হ'লো রানী রাসমণির, মথুরবাবুর আর হৃদয়রামের।

ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে ব'সে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিয়মিতভাবে তন্ত্র-সাধনা অভ্যাস করতে লাগলেন। যে রামকৃষ্ণ ছেলেবেলায় পড়াশোনার নামে ভয় পেতেন তিনিই একে একে চৌষট্টিখানি তন্ত্রশাস্ত্র আয়ত্ত করলেন। তিন বছর কেটে গেল এইভাবে। শিষ্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যোগেশ্বরী এবার চল্‌লেন তীর্থযাত্রায়।

তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে ঠাকুরের যে-জ্ঞান লাভ হ'লো, তাতে ক'রে তিনি ঈশ্বর-মহিমা ও মহাভাবের সকল লক্ষণ স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন। কিন্তু সাধনার চরম অবস্থায় তিনি তখনও পৌঁছুতে পারেননি। তাই, মনে মনে একটা আক্ষেপ আর অশান্তিও যেন দানা বেঁধেছিল তাঁর।

ঠিক সেই সময় আবির্ভাব হ'লো এক সন্ন্যাসীর।

ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী স্বামী এলেন রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণকে সাধনার চরম অবস্থায় পৌঁছে দিতেই যেন আবির্ভাব হ'লো তাঁর।

এই তোতাপুরী স্বামীর কাছেই রামকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনা করেন।

দক্ষিণেশ্বরে গেলে তোমরা দেখতে পাবে সুবিখ্যাত পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীতে ব'সেই রামকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনা ক'রেছিলেন সাতশ' নাগা সন্ন্যাসীর প্রধান তোতাপুরী স্বামীর কাছে।

ঠাকুর মন্ত্র শেখেন, হোমে বসেন, ধ্যান করেন।

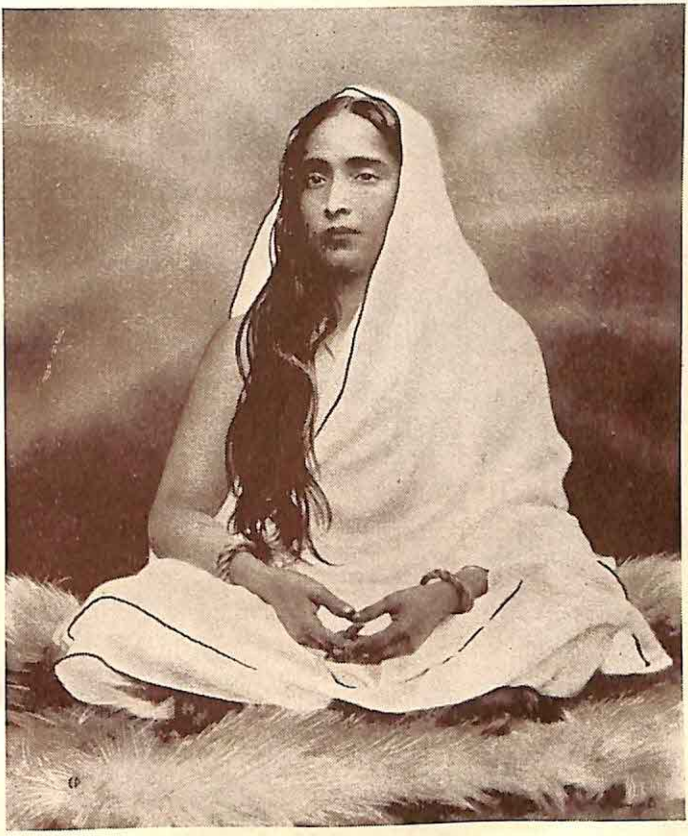
ধ্যান করতে করতে একদিন তিনি একেবারে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। যাকে বলে নির্বিকল্প সমাধি। বাহ্যিক কোনো চেতনাই থাকে না তখন। তিন দিন, তিন রাত্রি কেটে গেল এই অবস্থায়। এক অপূর্ব জ্যোতিতে ঠাকুরের সারা দেহ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সাধনার চরম অবস্থায় এইভাবে পৌঁছে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মূলে তোতাপুরী যে প্রেম, ভক্তি ও ভাবের পরিচয় পেলেন—এর আগে তিনি তা কারও মধ্যে দেখেননি। তাই, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তিনি রামকৃষ্ণকে 'পরমহংসজী' ব'লে অভিনন্দিত করলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন থেকেই রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত।

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে, তোতাপুরী স্বামী চ'লে গেলেন তীর্থযাত্রায়। এই এগার মাস শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে বহু জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন। সে-জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা নেই, সে-জ্ঞান অফুরন্ত। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে-ভাবে এক মহাজ্ঞানীতে পরিণত হলেন, তা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়।

যোগ-সমাধিতে ব'সে ঠাকুর যখন বাইরের চেতনা হারাতেন, তখন তাঁর মনের যে-অবস্থা হ'তো সে-কথা তাঁর ভাষাতেই শোনো—"যে-অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পোঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটা থাকে, তারপর শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে, তেমনি প'ড়ে যায়—সেই অবস্থায় ছ'মাস ছিলুম। কখন কোন্ দিকে যে দিন আসতো,



রাত যেত, তার ঠিক-ঠিকানাই হ'তো না। মরা মানুষের মুখে যেমন মাছি ঢোকে, তেমনি ঢুকতো, কিন্তু সাড় হ'তো না।"

এই সমাধির অবস্থায় তিনি যে-আনন্দ লাভ করতেন—তা' দিব্য-আনন্দ। জ্যোতির সমুদ্রে অবগাহন ক'রে তিনি আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌তেন।

॥ নয় ॥

সাধনায় সিদ্ধিলাভের সাত-আট বছর আগে, রামকৃষ্ণ একবার কামারপুকুর যান। তখন তাঁর বয়স বছর চব্বিশেক।

ছেলের ভাবগতিক দেখে মা চন্দ্রা দেবী আগে থেকেই বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। ছেলেকে কাছে পেয়ে, এবারে তাই তিনি তাঁর বিয়ের কথা পাড়লেন। মা ভেবেছিলেন, বিয়ে করলে হয়তো, ছেলের উন্মনা-ভাব কেটে যাবে, সে সংসারী হবে। ক'নে তাঁর আগে থেকেই পছন্দ করা ছিল।

মায়ের কথায় ছেলে বিয়ে করলো বটে, কিন্তু সংসারী হ'লো না।

রামকৃষ্ণ যে অসামান্যা মেয়েটিকে বিবাহ করেন, তিনিই উত্তরকালের শ্রীমা অর্থাৎ সারদামণি। মেয়ের মতো মেয়ে তিনি—মায়ের মতো মা। নিজের গুণে যে-সব ভারতীয় মহিলা সারা বিশ্বে স্মরণীয়া হ'য়ে আছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী মা সারদামণি তাঁদেরই একজন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, স্ত্রী হলেন স্বামীর ধর্মাচরণের প্রধান সহায়। তন্ত্রশাস্ত্রমতে, স্ত্রী শুধু স্বামীর সহায়-ই নন্, তিনি হলেন স্বামীর মহাশক্তি। স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি সমান ভাব রেখে ধর্ম ও কর্ম ক'রে যেতে পারেন তো, তাঁদের জীবনে আসে দেবতার শুভাশীর্বাদ। রামকৃষ্ণ ও সারদাদেবার জীবনেও সেই আশীর্বাদ এসেছিল।

১৮৫৩ সালের শেষাশেষি বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীতে সারদেশ্বরীর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল—রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সারদাদেবীর বয়স যখন মাত্র পাঁচ কি ছয় সেই সময় তাঁর বাবা তাঁকে গৌরীদান করেন। যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়ে যায়।

রামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে নানা বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়ে ছিলেন। স্বামীর কাছে ঘরের কাজ থেকে শুরু ক'রে আধ্যাত্মিক বিষয়েও অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বর কে, কি করলে, কোন্ পথে গেলে তাঁকে পাওয়া যায়, সে-সমস্তই তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে অতি সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন। সারদাদেবীর মস্ত বড় গুণ ছিল যে, তিনি তাঁর স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতেন। স্বামীর গৌরবে তিনি ছিলেন পরম সুখী।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ছিলেন সারদাদেবী। কাজেই, কায়িক পরিশ্রম কাকে বলে তিনি তা ভালো ক'রেই জানতেন। কায়িক পরিশ্রমে কোনদিনই তিনি কুণ্ঠিতা হননি।

জয়রামবাটী থেকে একবার সারদাদেবী যখন তাঁর অসুস্থ স্বামীকে দেখবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করেন, সেই কাহিনী

থেকেই তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও সহ্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে রেলগাড়ি বা মোটরের কোনো চল ছিল না। পায়ে হেঁটে কিংবা গোরুর গাড়িতে চ'ড়ে সে-সময়কার লোকজন যাওয়া-আসা করতো। সারদাদেবীও কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পদব্রজে যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। একে পথ বড় কম নয়, তার ওপরে সে-পথে ডাকাতদেরও উপদ্রব ছিল। সারদাদেবী নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে এই বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়েছিলেন।

পথে একবার ডাকাতের হাতেও পড়েন। কিন্তু, সাধারণ মেয়েমানুষের মতো তিনি ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেননি। শান্ত-স্বরে তিনি ডাকাতদের বলেছিলেন—দেখ বাবা, আমি পথ হারিয়েছি। তোমরা যদি দয়া ক'রে আমাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দাও। ডাকাতরা তাঁর মুখ থেকে ঐ স্নেহমাখা 'বাবা' ডাক শুনে একেবারে গ'লে গিয়েছিল এবং তারাই সারদাদেবী ও তাঁর সঙ্গীদের দক্ষিণেশ্বরের কাছ বরাবর পৌঁছে দিয়ে যায়।

লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়, সারদাদেবীর ভাগ্যে তা না জুটলেও, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতির যে-সব তত্ত্বকথা জেনেছিলেন, তা থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার বনিয়াদ পাকা হয়েছিল। সাংসারিক জীবনে সারদাদেবী ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত—স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ছিল তাঁরও আদর্শ।

একবার রামকৃষ্ণের এক মাড়োয়ারী ভক্ত এসে জানালো যে, সে ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা প্রণামী দিতে চায়। কিন্তু

রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে অর্থের কোনো মূল্যই ছিল না। তিনি বলতেন—টাকা আর মাটি, মাটি আর টাকা, একই জিনিস। তাই মাড়োয়ারীর প্রণামী দেবার প্রস্তাব শুনে, তিনি তখন সারদাদেবীকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে ডেকে বললেন—"দেখ, আমার এই বড়লোক ভাইটি আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছে। আমি নেব না শুনে, সে বল্‌ছে, তোমাকে ঐ টাকা নিতে হবে! তা তুমি নেবে কি?"

সারদাদেবী তো শ্রীরামকৃষ্ণেরই সহধর্মিনী! তিনি হাসি-মুখেই জবাব দিয়েছিলেন—"না। আমি কি ক'রে নেব? আমি নিলেও তো তোমারি নেওয়া হবে। তুমি হ'লে ত্যাগী-পুরুষ। লোকে সেইজন্যই তোমাকে শ্রদ্ধা করে। টাকা নিয়ে আমাদের কি হ'বে? ও-সবে আমাদের কোনো দরকার নেই।" সারদাদেবীও স্বামীর মতো অর্থ ও বিভব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষায় তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল। দেহত্যাগের আগে রামকৃষ্ণদেব গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। সে-সময় রাতদিন তাঁর সেবা করতেন সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম দিনগুলি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা বহু জায়গায় এ-কথা উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীসেবায় মা সারদামণি ছিলেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী।

শ্রীমার জীবন ঘটনাবহুল না হলেও, তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের এক আদর্শ নারীচরিত্র। তাঁর চোখে সকল ভক্তই ছিল সমান। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—তিনি ছিলেন সকলেরই শ্রীমা। তাঁর দয়া ও করুণা থেকে কেউ কোনদিন বঞ্চিত

হয়নি। ত্যাগে, সেবায় ও ধর্মাচরণে মা সারদামণি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত সহধর্মিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মা-কালীর সাধক।

তিনি সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই মা-কালীকে দেখতেন। সারদামণির মধ্যেও তিনি সেইরকম মা-কালীকে দেখতে পেতেন। তিনি তাঁকে কালী-জ্ঞানে পূজাও করেছিলেন।

সাধনার মধ্য দিয়েই রামকৃষ্ণ এ-কথা জেনেছিলেন যে, সবকিছুর মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবান বিরাজ করছেন একাধারে—

একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বাগানের সবুজ ঘাসের শোভা দেখে তিনি একেবারে তন্ময় হ'য়ে যান। তাঁর যেন মনে হয় বিশ্বস্রষ্ঠা স্বয়ং ছড়িয়ে আছেন সবুজ ঘাসের শ্যামলিমায়। হঠাৎ ঘাস মাড়িয়ে কে যেন চ'লে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে রামকৃষ্ণের মনে হ'লো কে যেন তাঁরই বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে যেমন যন্ত্রণা হয়, রামকৃষ্ণও সেইরকম যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন সেই সময়। আশ্চর্য হলেও ঘটনাটি সত্য।

আর একদিনের ঘটনা।

নদীর ঘাটে বসে রামকৃষ্ণ তন্ময় হ'য়ে গঙ্গার শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ দেখেন একদল মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। কথা কাটাকাটি থেকে একেবারে হাতাহাতি, একজন আর একজনের পিঠে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিল। রামকৃষ্ণ অমনি যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। লোকজন যে যেখানে

ছিল, ছুটে এলো হন্তদন্ত হ'য়ে। এসে দেখে ঠাকুরের পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ—সজোরে চড় বসালে যে-রকমটা হয়, ঠিক সেইরকম। ভাগ্‌নে হৃদয়রাম বল্‌লে—"মামা, কে তোমায় মেরেছে বল, আমি এখনি তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেই।" কিন্তু রামকৃষ্ণের মুখে সব কথা শুনে হৃদয়রাম তো হতভম্ব!

দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেলেই শ্রীরামকৃষ্ণের বহু স্মৃতিচিহ্নই আমাদের চোখে পড়ে। যেমন—পঞ্চবটী, বেলতলা প্রভৃতি।

পঞ্চবটীর স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই। তিনিই একদিন নিজের হাতে অশ্বত্থ, বেল, বট, অশোক ও আমলকীর চারা পুঁতে পঞ্চবটী তৈরি করেছিলেন। গাছগুলি বড় হ'লে সেখানে তুলসীগাছ আর অপরাজিতার লতা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বড় নির্জন আর শান্ত পরিবেশ পঞ্চবটীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বেশির ভাগ সময় এখানে ব'সেই ধ্যান করতেন। ভক্তজনের কাছে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তাই তীর্থস্থান।

পঞ্চবটী থেকে আরও খানিকটা উত্তরে গেলে একটি বেলগাছ দেখতে পাওয়া যাবে। এই বেলগাছটি বিখ্যাত হ'য়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার পুণ্যপীঠ ব'লে।

॥ ১০ ॥

রামতারক ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণের এক খুড়তুতো ভাইও দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে পুরোহিত ছিলেন। বয়সে তিনি ছিলেন ঠাকুরের বড়।

রামতারককে শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকতেন 'হলধারী' ব'লে।

তু'জনের মধ্যে বেশ একটা সৌহার্দ্য ছিল।

রামতারক মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য নানা রকম বক্রোক্তি করতেন।

রামকৃষ্ণ তাতে রাগ করতেন না মোটেই। বরং মা-কালীর আশীর্বাদে তিনি রামতারকের বক্রোক্তির স্পষ্ট জবাব দিয়ে তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে ফেলতেন।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি।

রামতারক একদিন বলেন—"তুমি তামসী মূর্তির উপাসনা কর কেন? এতে কি কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়?" রামতারক মনে করতেন কালী হলেন তামসী।

তাঁর কথায় ঠাকুরের মনে বড় আঘাত লাগলো। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন মন্দিরে। মা-কালীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তামসী কিনা। সদুত্তর পেয়ে তক্ষুনি আবার ছুটে এসে রামতারককে বল্‌লেন—"মা আমার শুদ্ধ সত্ত্ব, তুই বলিস মাকে আমার তামসী!" এই বলেই তিনি রামতারকের পিঠে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামতারকের সারা শরীরে এক অপূর্ব শিহরণ বয়ে গেল। তিনি যেন কেমন হ'য়ে

গেলেন। একরাশ ফুল নিয়ে তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। সকলে তো অবাক্। রামতারক এই প্রসঙ্গে হৃদয়রামকে বলেছিলেন—"কালীঘর থেকে ফিরে এসে ও কিরকম যে আমায় ক'রে দিলে, আমি সব ভুলে গেলাম। ওর ভিতরে এক অপূর্ব বিকাশ দেখলাম। তাই আমি ওকে পূজা করলাম।"

হৃদয়রাম ঠাকুরের ভাগ্নে। দিনরাত ঠাকুরের কাছাকাছি থাকে, তাঁর দেখাশোনা করে। তার হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হলো, সে-ও ঠাকুরের মতো ধ্যান করবে ভগবানকে দেখবার জন্য।

যে কথা সেই কাজ।

হৃদয় লক্ষ্য করেছে মামা পৈতে-টৈতে ফেলে দিয়ে পঞ্চবটীতে গিয়ে চোখ বুজে ধ্যান করে। সে-ও তাই পৈতে ফেলে দিয়ে পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যানে বসলো। রামকৃষ্ণ সেই সময় সেদিক দিয়েই আসছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে হৃদয়রাম হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম।" রামকৃষ্ণ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? হৃদয় তখন সকাতরে বল্‌লে—"মামা গো, এখানে ধ্যান করতে বসেছি, আর কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে। ভয়ানক যাতনা হচ্ছে।" শুনে ঠাকুর মৃদু হাসলেন। তারপর হৃদয়রামের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"হৃদু, তুই ওরকম করিস্‌নি। তুই কেবল আমার কাছে থাকবি, সেবা করবি, তোর আর কিছু করতে হবে না।"

হৃদয়রাম ঠাকুরকে কাছে থেকে বহুবার লক্ষ্য ক'রে দেখেছে যে, ঠাকুরের শরীর যেন রক্তমাংসের শরীর নয়, তাঁর শরীর যেন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। সর্বক্ষণ তাঁর শরীর দিয়ে যেন একটা দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দিকে। ঠাকুরের কৃপায় হৃদয়রামেরও বহুবার ভাবাবেশ উপস্থিত হয়েছে। ভাবাবেগে সে কখনও কালী-মহিমা কীর্তন করেছে, কখনও বা নেচে উঠেছে আনন্দে।

মথুরবাবুর মনেও ভাবাবেশ উপলব্ধি করবার বাসনা জাগে। তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল রামকৃষ্ণের কৃপায়। তিন দিন ধরে মথুরনাথ আর কোনো দিকে মন বসাতে পারেননি—কেবল ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া। কিন্তু বিষয়ী লোক তিনি। কাজকর্ম বন্ধ থাকলে বিষয়-আসয় সব যে নষ্ট হ'য়ে যাবে। তাই চতুর্থ দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পা ছু'টো জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন—"বাবা, অপরাধ হয়েছে। আজ তিন দিন ধ'রে ওই অবস্থা। কাজকর্মের দিকে মন নেই। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার বিষয়-আসয় সব গেল। তোমার ভাব তোমাতেই থাক।...আমি বিষয়-কর্ম করব আর প্রাণ ভ'রে শুধু তোমার সেবা করব।" ঠাকুর হেসে বল্‌লেন—"বেশ তাই হবে।"

ঠাকুর কিন্তু দিনরাত ঘুরে বেড়ান খালি গায়ে। তাই দেখে মথুরবাবুর খুব ইচ্ছে হ'লো ঠাকুরকে একখানা দামী শাল প্রণামী দেন। শাল দেখে ঠাকুরের কি আনন্দ। মথুর দিয়েছে শালখানা গায়ে জড়িয়ে রামকৃষ্ণ সবাইকে দেখিয়ে বেড়ান। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হ'তেই শালখানা ছুঁড়ে ফেলেন মাটিতে,

আর পা দিয়ে মাড়াতে থাকেন। বলেন—"ওরই নাম শাল। গায়ে দিলে লোকের অহঙ্কার হয়। কিন্তু ওতে আছে কি? কতকগুলি ছাগলের লোম বই তো নয়!" শালের দুর্দশার কথা যথাসময়ে কানে যায় মথুরবাবুর। কিন্তু তিনি কোনো দুঃখ করেন না। ভাবেন সর্বত্যাগী সাধকপুরুষ যিনি, তাঁর মনে কি কখনও অহঙ্কার হ'তে পারে—ভোগবিলাস তো তাঁর জন্য নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সাধারণ-মানুষের পরম হিতৈষী। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা দূর করবার জন্যই তাঁর সাধনা, আর সেই সাধনাতেই তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের।

একবার তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন মথুরবাবু স্বয়ং, আর তাঁর পরিবারের লোকজন। দেওঘরের কাছাকাছি এক গ্রামের মধ্য দিয়ে যখন তাঁরা যাচ্ছেন, তখন সেখানকার লোকদের দারিদ্র্য আর দুর্দশা দেখে রামকৃষ্ণের মন করুণায় উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি মথুরবাবুকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—"তুমি তো মা'র দেওয়ান। এক কাজ কর তুমি। এদের সকলকে একমাথা ক'রে তেল আর একখানা ক'রে কাপড় দাও। আর পেটভ'রে খাইয়ে দাও একদিন।" মথুরানাথ তখন খরচের পরিমাণ হিসাব করছিলেন। একে তীর্থভ্রমণের খরচ, তার ওপরে যদি এতগুলো লোককে তেল, কাপড় আর খাবার দিতে হয় তো সর্বনাশ! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার। মথুরবাবুর কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এই গরীবদের কাছেই রইলুম।"

মথুরনাথ দেখলেন মহাবিপদ।

অগত্যা তিনি ক'লকাতায় লোক পাঠিয়ে কাপড়-চোপড় আনালেন। তারপর গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন সেই সব বিলানো হ'লো এবং তাদের একদিন পেটভ'রে খাওয়ানো হ'লো তখন ঠাকুর খুশি হ'য়ে কাশী রওনা হলেন। ঠাকুরের আনন্দ দেখে মথুরনাথও খুব খুশি।

কাশীতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সব ঘুরে ঘুরে দেখেন। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন মন্দিরের চত্বরে বা গঙ্গার ঘাটে।

একদিন ঠাকুর বল্‌লেন—"মথুর! তুমি আজ কল্পতরু হ'য়ে ব'সো।" যে-কথা সেই কাজ। মথুর সেদিন কল্পতরু হ'য়ে বসলেন। সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইলো তিনি তাকে তাই দান করলেন। মথুরের ইচ্ছা হ'লো, ঠাকুরকেও সেদিন কিছু দান করেন। কথা শুনে ঠাকুর হাসলেন। কোনো কিছুরই তো তাঁর অভাব নেই, কী চাইবেন তিনি। কিন্তু না চাইলে মথুর মনে কষ্ট পাবে। তাই তিনি বল্‌লেন—"আচ্ছা, একটা কমণ্ডলু দাও।" অবাক্ হ'লেও খুশি হলেন মথুরানাথ। কমণ্ডলু দান করলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঋষিকে।

মথুরানাথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুরের নামে হাজার কয়েক টাকার কোম্পানির কাগজ ক'রে দেন, যাতে না মথুরানাথের অবর্তমানে ঠাকুরের কোনো কষ্ট হয়। কিন্তু, টাকার কথা শুনলেই ঠাকুর রাগ করেন। তাঁর কাছে টাকার তো কোনো দামই নেই। তাঁর কাছে টাকাও যা,

মাটিও তা। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি। তিনি কি করবেন টাকা দিয়ে!

শুধু কি তিনিই এ-রকম? তাঁর মা চন্দ্রাদেবী, যিনি গৃহস্থ বধূ, অভাব আর অনটন যাঁর নিত্যসাথী, মথুরানাথ তাঁকেও টাকা নেওয়াতে রাজি করাতে পারেননি। মথুরানাথকে তিনি বলেছিলেন—"আমার কোনো অভাব নেই, বাবা। আমি গঙ্গাস্নান করছি, মা-কালীর প্রসাদ পাচ্ছি, গঙ্গাতীরে বাস করছি, আর আমার কি চাই বলো?" এমন কথা মথুরানাথ শোনেননি কোনোদিন। অথচ, ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়, চন্দ্রাদেবীর কথায় কি সুগভীর তত্ত্বই না লুকিয়ে রয়েছে। গঙ্গাস্নানে পুণ্যলাভ। মা-কালীর প্রসাদে ক্ষুধার উপশম। গঙ্গাতীরে বাসস্থান। অর্থাৎ, আশ্রয়, আহার্য ও পুণ্যলাভের সব সুযোগই যাঁর আছে, তাঁর কি কোনো অভাব থাকতে পারে।

কিন্তু একটা কিছু না নিলে মথুরানাথ মনে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে, রামকৃষ্ণ-জননী বল্‌লেন—"তবে বাবা তুমি আমায় চার পয়সার দোক্তা কিনে দিও। আমার দোক্তা ফুরিয়ে গেছে।" এ-কথা শুনে মথুরনাথের ছু'চোখ ভ'রে আনন্দাশ্রু উথ্‌লে উঠ্‌লো। এমনভাবে দোক্তা চাওয়া তো রামকৃষ্ণ-জননীর পক্ষেই সম্ভব। চন্দ্রাদেবীর পায়ের ধূলো নিলেন ভক্ত জমিদার মথুরানাথ।

॥ এগার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হ'লেন যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ।

এইবার আমরা বলব, কিভাবে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠ শিষ্যের মর্যাদা পেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন রামকৃষ্ণের পরিচয় হয় সে-সময় বিবেকানন্দের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ক'লকাতার শিমুলিয়া (সিম্‌লে) দত্ত-পরিবারের ছেলে। কলেজে পড়ছেন সে-সময়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল ধর্মভাব।

সে-সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের খুব নামডাক। তাঁদের প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে দেশের শিক্ষিত যুবকদের খুব আনাগোনা ছিল। ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে দেশের বহু তরুণ ও যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে যান, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সারগর্ভ বক্তৃতা শোনেন মন দিয়ে। কিন্তু তিনি যা খোঁজেন, তা পান না সেখানে। তাঁর মনে তাই অশান্তি লেগে থাকে সর্বক্ষণ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকলেও, তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে সে-ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না। ঈশ্বরকে দেখেছেন কি না—এ-প্রশ্ন করায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন নিরুত্তর থাকেন,

তখন সন্দেহের দোলায় নরেন্দ্রনাথের মন দুল্‌তে থাকে। ঈশ্বরকে দেখতে চান তিনি, কিন্তু কিভাবে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, সে-পথের সন্ধান দিতে পারেন না কেউ—না চার্চের পাদ্রী, না মন্দিরের পুরোহিত, না মসজিদের ইমাম, না ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। ঈশ্বর-দর্শনাভিলাষী নরেন্দ্রনাথের মনে তাই শান্তি নেই। সর্বদা অস্থির তিনি।

১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের এক দিন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ এসেছেন ক'লকাতায়, তাঁর ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। নরেন্দ্রনাথ যে-পাড়ায় থাকেন, সুরেনবাবুও সে-পাড়ার বাসিন্দা।

নরেন্দ্রনাথ লোকমুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন। ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ ব'লে সে-সময় রামকৃষ্ণের বিশেষ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কিন্তু কলেজে-পড়া ছাত্র নরেন্দ্রনাথের মনে সে-সব খ্যাতি কোনো দাগ কাটতে পারেনি। তিনি ভাবতেন ও-সব ভণ্ডামি! রামকৃষ্ণের মতো একজন সামান্য পুরোহিত ও কালী-সাধক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, এ-কথা নরেন্দ্রনাথ সে-সময় যেন ভাবতেও পারেন না। তবু কৌতূহল ছিল লোকটিকে দেখবার। সুযোগও জুটে গেল রামকৃষ্ণ ক'লকাতায় আসাতে।

নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালো গাইতে পারতেন। বিশেষ ক'রে ভজন, কালীকীর্তন এ-সব।

রামকৃষ্ণকে ভজন-গান শোনাবার জন্য সুরেন মিত্রের বাড়িতে নরেনের ডাক পড়লো। এক কথায় রাজি হয়ে, নরেন গেলেন সে-বাড়ীতে ভজন গাইতে।

নরেন্দ্রনাথকে দেখে ঠাকুর কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। একে বলিষ্ঠ যুবক, তার ওপরে সুদর্শন। আর সবচেয়ে সুন্দর নরেনের ভাবপূর্ণ চোখদুটি। রামকৃষ্ণ একভাবে চেয়ে রইলেন নরেনের মুখের দিকে। বড় ভালো লাগছিল তাঁর।

নরেন এক এক ক'রে কয়েকটি ভজন শোনালেন রামকৃষ্ণকে। ঠাকুরের তো আনন্দের সীমা নাই। গান শোনেন আর একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন নরেনের মুখের দিকে। গান থামলে নরেনকে বল্‌লেন একদিন দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য।

দিন কয়েক পরে নরেন তাঁর জনকয়েক বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুর তো মহাখুশি। আদর ক'রে বসালেন সবাইকে।

ঠাকুরের অনুরোধে গান ধরলেন নরেন্দ্রনাথ—"মন, চল নিজ নিকেতনে; সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।" সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে গান গাইলেন নরেন্দ্রনাথ। গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের সর্বশরীরে রোমাঞ্চ দেখা যায়, তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে আনন্দের অশ্রু। ভাব-সমাহিত ঠাকুরের দিকে চেয়ে নরেন্দ্রনাথও মনে মনে খুব খুশি হন, তাঁর শরীরেও জাগে পুলক-শিহরণ।

গান শেষ হ'লে, ঠাকুর নরেনের হাত ধ'রে নিয়ে যান এক নির্জন জায়গায়। তারপর নরেনের হাত ধ'রে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেন—"ওরে, আমি যে তোর জন্যেই ব'সে আছি। এতদিন পরে কি আসতে হয়!" তারপর হঠাৎ, হাত দু'টি জোড় ক'রে, নরেনকে উদ্দেশ ক'রে ঠাকুর

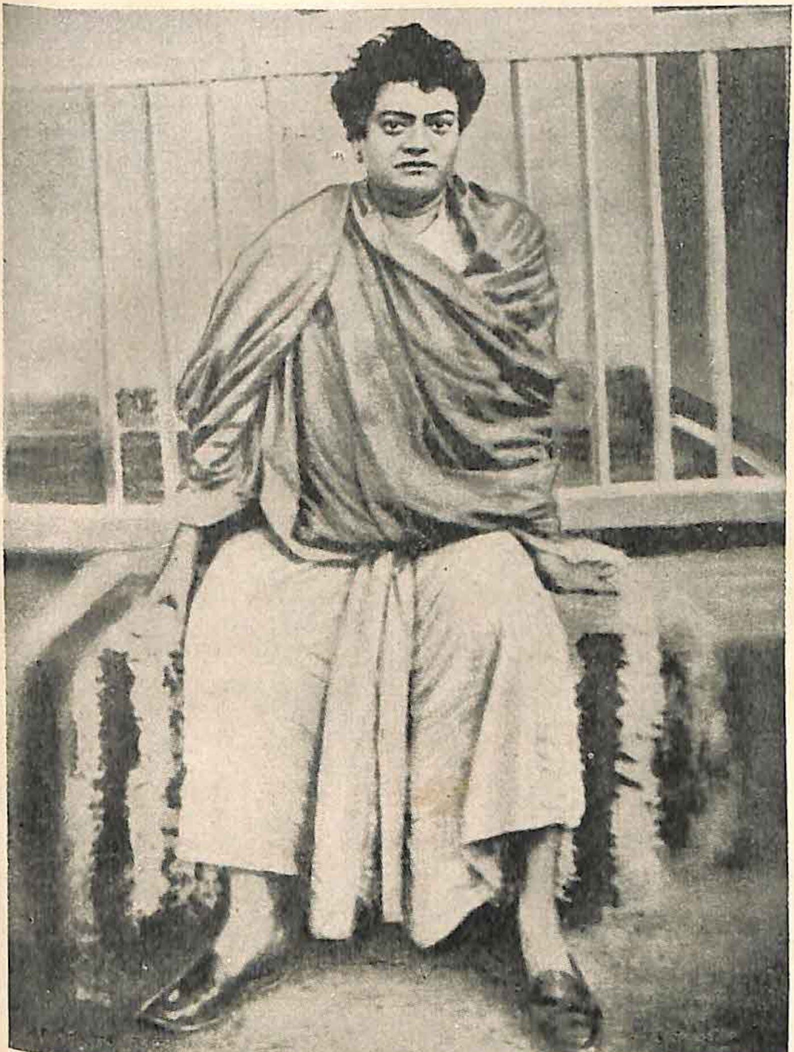
বলেন—"জানি প্রভু, তুমি সেই ঋষি—মানুষরূপী নারায়ণ, এসে শরীর ধারণ করেছ জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য।"

নরেনের তো বিস্ময়ের সীমা নেই। কী বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ! শেষকালে তিনি কি এক পাগলের পাল্লায় এসে পড়লেন! তিনি যখন এইরকম ভাবছেন, ঠাকুর তখন ঘরের ভিতরে গিয়ে মাখন, মিছ্‌রি আর সন্দেশ নিয়ে এলেন নরেনের জন্য। নরেন তো খাবেন না কিছুতেই। কিন্তু ঠাকুরও তাঁকে মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত খেতেই হ'লো। রামকৃষ্ণ নিজের হাতে সন্দেশ নিয়ে নরেনের মুখে পুরে দিতে লাগলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

ঠাকুর বল্‌লেন—"দেখেছি বৈকি! তোকে যেমন দেখছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখি। তাঁকে দেখাও যায়, আর তাঁর সঙ্গে কথাও কওয়া যায়। তুই যদি তাকে দেখতে চাস্ তাহ'লে তুইও তাঁকে দেখতে পাবি।"

রামকৃষ্ণের মুখে স্পষ্টভাবে এই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথের মনের অশান্তি যেন দূর হ'লো। যাক্, এতদিন বাদে তিনি এমন একজনের সন্ধান পেয়েছেন, যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, এমনকি দেখাতে পারেন পর্যন্ত। খুশিতে মন ভ'রে উঠ্‌লো নরেন্দ্রনাথের। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি আবার গাইলেন। গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। অপূর্ব এক জ্যোতি যেন ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সর্বাঙ্গে। বিস্ময়ভরা



স্বামী বিবেকানন্দ

চোখ মেলে তাঁর সেই রূপ দেখে নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হ'য়ে পড়লেন।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু একদিনেই ঠাকুরের শিষ্য হ'য়ে পড়েননি। বহু পরীক্ষা করেছেন তিনি রামকৃষ্ণকে। নিজের মনের সকল দ্বন্দ্ব যখন ঘুচে গেছে, ঠাকুরের প্রতি যখন এসেছে গভীর বিশ্বাস—কেবল সেই মুহূর্তেই তিনি ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

কেশবচন্দ্র সেন আর নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একদিন বলছিলেন যে—"একটা শক্তির বলে কেশব জগতে বিখ্যাত হয়েছে, সেইরকম আঠারোটা শক্তির বিকাশ দেখতে পেলুম নরেনের মধ্যে।" কথা শুনে নরেন ব'লে উঠ্‌লেন—"করেন কি আপনি? লোকে আপনার এই কথা শুনে বলবে আপনি পাগল। কোথায় জগদ্বিখ্যাত মহা-পণ্ডিত কেশব, আর কোথায় আমি কলেজের একটা নগণ্য ছোঁড়া। আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন বলুন তো? আর কখনো এ-রকম কথা বলবেন না।"

নরেনের কথা শুনে ঠাকুর হাসেন, আর বলেন—"কি করবো রে, তুই কি মনে করিস্ আমিই বলেছি ওরকম। 'মা' আমাকে ঐ রকম দেখালেন তাই তো বলেছি। 'মা' তো আমাকে সত্য ছাড়া মিথ্যা দেখান না, তাই তো বলেছি।"

আর একদিনের ঘটনা।

নরেন সেদিন একা গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। গিয়ে দেখেন, ঠাকুর ব'সে আছেন একাকী। কী যেন ভাবছেন নিবিষ্ট মনে।

নরেনকে দেখেই ঠাকুরের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি আদর ক'রে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন। তারপর কি যেন বল্‌তে বল্‌তে স্পর্শ করলেন নরেনকে। স্পর্শ করা মাত্রই নরেনের মনে এক অদ্ভুত ভাব উপস্থিত হ'লো। তাঁর সারা শরীরে জাগলো এক অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন চোখের সামনে যা-কিছু আছে সব যেন ঘুরতে ঘুরতে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তিনিও যেন মহাশূন্যে ছুটে চলেছেন। ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ—"ওগো আমায় তুমি এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন, তাঁদের সেবা করতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন হেসে নরেনের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"তবে এখন থাক্‌। সময়ে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে নরেন ফিরে এলেন তাঁর সহজ অবস্থায়। ঠাকুর তখন তাঁকে আদর ক'রে খেতে দিলেন, অনেকক্ষণ নানারকম গল্প করলেন।

তারপর থেকে একটা প্রবল আকর্ষণ নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। ঠাকুরকে একদিন না দেখলে তাঁর মন ছট্‌ফট্‌ করে। ঠাকুরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে। নরেন্দ্রনাথ যেবার বি-এ পরীক্ষা দিলেন, সেবার হঠাৎ তাঁর বাবা মারা গেলেন। ফলে, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো নরেনের ঘাড়ে। উপার্জনের জন্য তিনি তখন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শহরের সর্বত্র। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও কোনো চাকরি-বাকরি তিনি জোটাতে পারলেন না। অতি কষ্টে সংসার চলতে লাগলো।

দুর্দশার আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এই অবস্থায় তিনি দীর্ঘদিন তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারলেন না।

লোকমুখে নরেনের সব খবরই পান রামকৃষ্ণ। নরেনের জন্য তাই তাঁর ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু সন্ন্যাসী তিনি, কেমন ক'রে নরেনের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করবেন।

একদিন নরেন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির। তাঁর মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, পরনের বেশবাস ময়লা, মুখখানা শুক্‌নো। ঠাকুর তো তাঁকে দেখতে পেয়েই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নরেন খুলে বল্‌লেন তাঁর সংসারিক দুরবস্থার কথা। সেই সঙ্গে প্রার্থনা জানালেন ঠাকুর এমন কিছু করুন যাতে নরেরেন সাংসারিক অভাব-অনটন দূর হয়। সব শুনে ঠাকুর বল্‌লেন—"বেশ তো, তুই মন্দিরে গিয়ে মা-কে সব কথা বল, তাহ'লে তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। মাকে তুই মানিস্ না সেজন্যই তোর এত কষ্ট।" কিন্তু নরেন তাতে রাজি নন্। তিনি ঠাকুরকে বলেন যে, তাঁর হ'য়ে তিনিই যেন মা-কালীকে সব বলেন। সে-কথার উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেন—"ওরে আমি তো কতবার বলেছি তোর জন্যে—যে, মা নরেনের দুঃখকষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস্ না বলেই তো মা কথা শোনে না। আচ্ছা এক কাজ কর, আজ তুই মার কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। আমি বলছি তুই যা।"

শেষ পর্যন্ত নরেন গেলেন মন্দিরে। মা-কালীর মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মনের এক অদ্ভুত অবস্থা হ'লো।

তাঁর মনে হ'লো মা যেন জীবন্ত হ'য়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো তাঁর মন। মাকে প্রণাম ক'রে নরেন তখন বল্‌লেন—"মা, জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। তোমার চিন্ময় মূর্তি সর্বক্ষণ যাতে দেখতে পাই, সেইরকম ক'রে দাও।" কী চাইতে গিয়ে, তিনি কী চাইলেন!

মন্দির থেকে বাইরে আসতেই রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে চেয়েছিস তো সব মায়ের কাছে? তোর দুঃখকষ্টের কথা বলেছিস তো?" নরেনের যেন এবার চমক ভাঙলো। মায়ের চিন্ময় মূর্তি দেখা অবধি তিনি এতক্ষণ যেন আনন্দ-জগতে বিচরণ করছিলেন। ঠাকুরের কথায় তাঁর টনক নড়লো। তিনি বল্‌লেন—"না ও-কথা তো বলিনি। বলতে ভুলে গেছি।" ঠাকুর অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"যা, যা, ফের যা। গিয়ে ঐ-সব ব'লে আয়।"

ঠাকুরের কথায় নরেন আবার মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন। কিন্তু, "মা আমায় ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও, বিবেক দাও" ছাড়া—আর কোনো কথাই মুখ দিয়ে বের হ'লো না। তিনবার এইভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু, যতবারই যান ততবারই মুখদিয়ে ঐ একই কথা বের হ'লো। সাংসারিক অভাব মোচনের প্রার্থনা তিনি জানাতে পারলেন না চিন্ময়ী মা কালীর কাছে।

রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আর মা-কালীর কৃপায় নরেন্দ্রনাথের মোটা-ভাত-কাপড়ের অভাব অবশ্য তাঁর আর হয়নি।

সেই থেকে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত হয়ে উঠলেন। নিজেকে তিনি সমর্পণ করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রীচরণে।

॥ বারো ॥

রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। তাছাড়া আরও অগণিত ভক্ত ও শিষ্য ছিল রামকৃষ্ণের। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, বলরাম বসু, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নাভা মহাশয়, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালীপ্রসাদ, তারক, প্রভৃতি অনেকে। এদের সকলেই সংসারী মানুষ, গৃহস্থ। তবু এঁরা ঠাকুরের কাছে যেন, নিজেদের একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরভক্ত বা জ্ঞানী কারও নাম শুনলেই রামকৃষ্ণের ইচ্ছা হ'তো তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। নিজেই গিয়ে উঠতেন তাঁদের বাড়িতে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বংলাদেশের এক বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাগ্মী। তাঁর সঙ্গে এক চমৎকার পরিবেশে রামকৃষ্ণের প্রথম আলাপ হয়। আর আলাপের পর থেকেই কেশবচন্দ্র ভক্ত ও অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠেন পরমহংসদেবের।

কেশবচন্দ্র তখন বেলঘরিয়ার এক বাগান-বাড়িতে বাস করছিলেন। একদিন সকালের দিকে রামকৃষ্ণ তাঁর ভাগ্নে

হৃদয়রামকে সঙ্গে ক'রে বেলঘরিয়ার সেই বাগান-বাড়িতে গিয়ে হাজির। কেশব সেন তখন তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিলেন। রামকৃষ্ণ গিয়ে সহজ ও সরলভাবে প্রশ্ন করলেন—"বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরের দর্শন পাও। সে কিরূপ দর্শন, আমাকে কিছু বল, আমি তা জানতে এসেছি।" ঠাকুরকে সকলেই প্রথমে এক সাধারণ মানুষ ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মুখে তত্ত্বকথা শুনে সকলেই বুঝেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা ঠাকুরটি সাধারণ তো নন্‌ই, বরং অসামান্য পুরুষ তিনি।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে গিয়ে ঠাকুর একসময় ভাবমগ্ন হ'য়ে পড়লেন। তাঁর দেহ স্থির, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মুখে অপূর্ব এক হাসির দ্যুতি। সকলেই খুব অবাক্‌ হ'য়ে গেলেন ঠাকুরের সমাধি-মগ্ন অবস্থা দেখে। এর আগে তো তাঁরা আর কাউকে এমনটা হ'তে দেখেননি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যখন তাঁর সমাহিত অবস্থা থেকে চেতনা ফিরে পেলেন, তখন ভাবাবিষ্টের মতই ব'লে গেলেন—"দেখ, ঈশ্বরের ভাব অনন্ত। তিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। একটা গাছে এক গিরগিটি থাকতো। একজন তাকে দেখে এসে বল্‌লে সেটা লাল। একজন এসে বল্‌লে সেটা হল্‌দে। আর একজন বল্‌লে সেটা নীল। অপর একজন এসে বল্‌লে সেটা সবুজ, এখনি আমি নিজের চোখে দেখে এলুম। এই নিয়ে তাদের মহাতর্ক বেধে গেল। একজন ঐ গাছতলায় থাকতো। এদের তর্ক শুনে সে বল্‌লে তোমাদের সকলের কথাই ঠিক।

ওটা বহুরূপী, যখন-তখন রং বদলায়। ঈশ্বরও সেইরকম। যে যেমনভাবে তাঁকে দেখেছে, সে তাই মনে করে।"

রামকৃষ্ণের মুখে এইরকম সরল কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে পেরে কেশবচন্দ্র ও তাঁর ভক্তরা তো স্তম্ভিত। কোনো কথার অলঙ্কার নেই, পাণ্ডিত্য নেই—অথচ, কেমন সরল ব্যাখ্যা।

ঈশ্বর-দর্শন সম্পর্কে ঠাকুর কত কথাই না ব'লে গেছেন। এখানে তার ছু'একটা উল্লেখ করা যাক্—

"শক্তি না জানলে ব্রহ্ম জানবার জো নেই। এ-ছু'য়ে অভেদ। যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি। একটা ছেড়ে আর একটা ভাবা যায় না। যেমন সূর্যের উত্তাপ ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

"সোনার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, তেমনি মাটির মা-কালীকে দেখলে ভক্তের মনে আসল মা-কালী, মা আনন্দময়ীর উদয় হয়।"

"তাঁকে পাওয়া যায় বিশ্বাসে, তিনি ভাবের বিষয়।

ব্রাহ্মদের কাছে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। তাঁরা ঈশ্বরের সাকারত্ব বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন—ঈশ্বর নিরাকার।

রামকৃষ্ণ কিন্তু বলেন—ঈশ্বর দুইই, সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। অর্থাৎ, যে যেমনটা ভাবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন—"তুমি সাকার মূর্তিকে কাঠ মাটি মনে করো কেন? সচ্চিদানন্দ ব'লে জ্ঞান করো। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমুদ্র। কুল-

কিনারা নাই। সেই জলের কোনো কোনো জায়গায় বরফ হয়েছে। বেশি ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক তেমনি ভক্তি-হিমে সাকার-রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গ'লে যায়, যেমন জল তেমনি, ঠিক তেমন জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গ'লে যায়।"

রামকৃষ্ণ বল্‌তেন—"কালীই ব্রহ্ম, আবর ব্রহ্মই কালী। যখন তিনি কোনো কাজ করছেন না—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে বলি ব্রহ্ম। আর যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। আসলে, তিনি একই, কেবল নাম রূপের তফাৎ। আমি সব রকমের করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্ত বাদীদেরও মানি। এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তাই সব মতের লোক আসে, আর সকলেই মনে করে ইনি (রামকৃষ্ণ) আমাদেরই মতের লোক।"

এই উক্তির মধ্যেই রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ধর্মমতের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, ধর্মে ধর্মে ভেদ টেনো না, ধর্ম একই। সর্ব ধর্মের মূলকথা হ'লো ঈশ্বর। ভিন্ন মতে ঈশ্বর উপাসনা করলেও, সে তো ঈশ্বরেরই উপাসনা। কাজেই, এক ধর্মের লোক আর এক ধর্মের লোককে হিংসা করবে কেন। মানুষে মানুষে কেন মারামারি, রেষারেষি হবে।

রামকৃষ্ণের গানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

"আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তখন খুব খ্যাতি। তাঁর কথা শুনে রামকৃষ্ণ একদিন তাঁর এক ভক্তকে বল্লেন তাঁকে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। বল্লেন—"তাঁকে দেখতে বড় সাধ হয়। দশে যাকে মানে গুণে, তাতে ভক্তির অধিক বিকাশ জানবি। সেখানে আছে ঈশ্বরের অধিক কৃপা। সেজন্য গুণীর সমাদর করতে হয়।"

যথাসময়ে সশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সমাদর ক'রে অভ্যর্থনা করলেন বিদ্যাসাগরমশাই। রামকৃষ্ণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্লেন—"এতদিন খাল বিল নদীতে ছিলুম, এবারে সাগরে এলুম।"

কথা শুনে বিদ্যাসাগরমশাই পুলকিত হ'য়ে বল্লেন—"তাহ'লে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।"

রামকৃষ্ণ বল্লেন,—"তা কেন গো, তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি নোনা জল কেন হবে? তুমি ক্ষীর সমুদ্র।"

তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে তিনি বিদ্যাসাগরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। রামকৃষ্ণ যে অতি সহজভাবে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে জানেন বিদ্যাসাগরমশাই আগে তা ভাবতেই পারেননি। সহজ ক'রে কঠিন তত্ত্ব বোঝানো তো আর সহজ কথা নয়। রামকৃষ্ণের সেই অসাধারণ গুণটি দেখে বিদ্যাসাগর তাই অবাক্ না হয়ে পারলেন না।

রামকৃষ্ণপরমহংস গুণগ্রাহী। বিদ্যাসাগরমশাইকে তিনি একটি গান শোনালেন। বিদ্যাসাগর যেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য পুরস্কৃত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠনিঃসৃত ভাবসঙ্গীতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন ঈশ্বরপরায়ণ লোক। লোক মুখে ঠাকুর শুনেছেন একথা। তাই, তাঁকে দেখবার ভারি ইচ্ছা হ'লো তাঁর। একদিন মথুরবাবুকে বল্‌লেন সে-কথা। মথুরবাবুর সহপাঠী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দু কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন তাঁরা।

ঠাকুরের আগ্রহ দেখে, মথুরবাবু একদিন রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয় হ'লো। সরল বালকের মতো ঠাকুর হঠাৎ ব'লে বস্‌লেন—

"তোমার গায়ের জামা খোল। আমি তোমার গা দেখব।"

সবাই তো অবাক্! দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌লা ঠাকুর বলে কি!

কিন্তু ঠিকই বলেছেন রামকৃষ্ণ। যাঁরা ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের শরীরে নানারকমের লক্ষণ বা চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের গায়ের জামা খুলে রামকৃষ্ণ সেই সব লক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। খুব যে খুশি হ'লেন, তা তাঁর উজ্জ্বল মুখখানি দেখেই বোঝা গেল। তারপর তিনি মহর্ষিকে বল্‌লেন—"তুমি সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও।"

এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চারিত্রিক গুণ। সমাজে যাঁরা ধার্মিক, বিদ্বান, ও পণ্ডিত ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের কাছে ব'সে আলাপ-আলোচনা করা, নতুন কিছু শেখা। নিজের

মনে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না বলেই তিনি সবার সঙ্গে এমন সহজভাবে মিশতে পেরেছিলেন।

রামকৃষ্ণের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ বেদ থেকে বাছা বাছা অংশ উদ্ধৃত ক'রে শোনালেন। ব্যাখ্যা ক'রেও বোঝালেন অনেক তত্ত্বকথা। মন দিয়ে শুনলেন পরমহংসদেব আর খুশিও হলেন খুব।

রামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে লাটু-মহারাজ বিখ্যাত হয়ে আছেন নানা কারণে। তাঁর বাড়ি ছিল বিহারের ছাপরা জেলায়। ভারি গরীব মানুষ। রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে খেটে খান। তাঁর আসল নাম—রাখতুরাম। তা থেকে লাতুরাম। শেষটায় লাটু—লাটু-মহারাজ।

রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন পরমহংসদেবের একজন বিশেষ ভক্ত।

তাঁর বাড়িতে সকলেই রামকৃষ্ণের কথা বলে, তাঁর গুণগান করে। কাজ করতে করতে লাটু শোনে সে-সব কথা। একদিন কৌতূহলী হ'য়ে সে তাই হাঁটতে হাঁটতে সোজা চ'লে গেল দক্ষিণেশ্বরে।

পরমহংসদেব তখন নিজের ঘরের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই, লাটু সোজা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলো। ঠাকুর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর ক'রে তাকে মা'র প্রসাদ খেতে দিলেন। লাটুর তো বিস্ময়ের সীমা নেই। চেনা নয়, জানা নয়—তার ওপরে, সে একজন চাকর মাত্র—অথচ ঠাকুর কেমন অম্লানবদনে তাকে আলিঙ্গন করলেন!

ক্রমশঃ লাটু ভক্ত হয়ে পড়লো পরমহংসজীর।

মাঝে মাঝেই সে আসে দক্ষিণেশ্বরে, আর ঠাকুরের কাছে ব'সে তাঁর কথা শোনে। ঠাকুরও বিশেষ আদর করেন লাটুকে। এইভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতেই, লাটু বিশেষ ভক্ত হ'য়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণের। দত্তবাড়ির কাজকর্ম ছেড়ে সে সোজা গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে রইলো। আর, নিজের জীবন পণ করলো ঠাকুরের সেবায়।

লাটু মূর্খ, লেখাপড়ার ধার দিয়ে সে যায়নি কখনো। রামকৃষ্ণ কি ভেবে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন। ভক্তদের একজনকে ডেকে বল্‌লেন—"দেখ, বর্ণ-পরিচয় প্রথম-ভাগ একখানা আন তো। লেটোকে পড়াব। শেষটায় আমার মতো মুক্ষু হয়ে থাকবে? একটু একটু পড়ুক।"

ঠাকুর নিজেই 'অ আ ক খ' শেখাতে লাগলেন লাটুকে। কিন্তু লেখাপড়া কিছুতেই হ'লো না লাটুর। উচ্চারণই ঠিক মতো হয় না, তো পড়াশোনা। কিন্তু এই নিরক্ষর লাটু বা লাটু-মহারাজ নিজের ভক্তি ও অধ্যবসায়ের গুণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। ভবিষ্যৎকালের স্বামী অদ্ভুতানন্দ-ই হলেন লাটু-মহারাজ।

আর যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হিসাবে বিখ্যাত হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় এঁদের—স্বানী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল), স্বামী যোগানন্দ (যোগীন্দ্রনাথ), স্বামী নিরঞ্জনানন্দ (নিত্য-নিরঞ্জন সেন), মাষ্টারমশাই বা শ্রীম (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত রচয়িতা মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত) প্রভৃতি।

॥ তেরো ॥

আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের যে-সব অমূল্য কথা শুনিয়ে গেছেন, যে-সব সদুপদেশ দিয়ে গেছেন তার তুলনা নেই। এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

"এই জগতে বিদ্যামায়াও আছে, অবিদ্যামায়াও আছে। ভালো-ও আছে, মন্দও আছে। মতও আছে আবার অমতও আছে। ব্রহ্ম কিন্তু নির্বিকার। সূর্য সমানভাবেই আলো দিচ্ছে। যে শিষ্ট তার উপরেও আলো দিচ্ছে, আর যে অশিষ্ট তার উপরেও আলো দিচ্ছে। যদি বল দুঃখ, পাপ, দ্বেষ, হিংসা এসব তবে কি? ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম সর্বদাই নির্বিকার। সাপের ভেতরে বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে ম'রে যায়, সাপের কিছুই হয় না।"

"ছাদে বেশীক্ষণ লোক থাকতে পারে না। আবার নেমে আসতে হয়। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন, তিনিই (ঈশ্বরই) হয়েছেন জীবজগৎ। এই জগৎ কি চমৎকার! কত রকমের জীব! বড়, ছোট, ভালো, মন্দ, কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। ফল, ফুল, বৃক্ষ।"

"কৃষ্ণ, রাম, কালী এ-সব রূপ কেমন জান? যেমন জলের তরঙ্গ। সচ্চিদানন্দ-সাগরে এক একটি তরঙ্গ।"

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলে আর একটিকে মানতে হয়।...যেমন সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, তেমনি সূর্যের রশ্মি বাদ দিয়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

"মা যখন হাত ধ'রে নিয়ে যায়, প'ড়ে যাবার আর ভয় থাকে না। বর্ষার সময় পেছল আলের উপর দিয়ে বাপ আর ছেলে যাচ্ছে। এখন ছেলে যদি বাপের হাত ধ'রে যায়, পিছলে প'ড়ে যেতে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, তাহ'লে প'ড়ে যাবার ভয় থাকে না। তেমনি মার উপর বিশ্বাস ক'রে তাঁর উপর সব ভার দিলে, কোনো ভয় থাকে না, কোনো গোলযোগ থাকে না।"

"অর্জুনের মতো পুরুষত্ব চাই। যেটা ধরব, সেটা করবই, প্রাণপণ, ছাড়ব না। এরই নাম পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব।"

"যার অভিমান নেই তারই জ্ঞান হয়।"

"বই, শাস্ত্র-টাস্ত্র এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ ব'লে দেয়। পথ জেনে নেওয়ার পর আর বই-শাস্ত্র কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়। অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে। কিন্তু, বই প'ড়ে শুধু পণ্ডিত হয়ে কি হবে, যদি তার বস্তুলাভ না হয়? সব খবর জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়, তবে তো বস্তুলাভ হবে?"

"অনেকে মনে করে, বই না প'ড়ে বুঝি বিদ্যা হয় না, জ্ঞান হয না, কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা ভালো।"

"যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার—এদের জ্ঞান হয় না।"

"তোমরা এই সংসারে নানা কর্তব্যে ব্যস্ত থাকো। কিন্তু সকলের আগে, সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পরমার্থিক কল্যাণের বিষয়ে, যাতে তা নষ্ট না হয়।"

"ওরে ভয় নেই। নিজেকে অধার্মিক, পাপী এসব বলতে নেই। আমি মুক্তপুরুষ, সংসারে থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি রাজাধিরাজের সন্তান, আমায় আবার বাঁধে কে? আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত—এই কথা রোক্ ক'রে বলতে হবে।"

"তুমি তোমার ভাইকে যে ভালোবাস, তা কাজ ক'রে দেখাও, সে-কথা শুধু মুখে ব'লো না। ধর্ম নিয়ে, মত নিয়ে, জাত নিয়ে তর্ক ক'রো না। সকল নদীই সাগরে গিয়ে মিলে। নিজেও চল, অপরকেও চল্‌তে দাও।"

"ঈশ্বর এক বই দুই নয়। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই। কেবল নামে তফাৎ। কেউ বল্‌ছে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বল্‌ছে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যিশু, দুর্গা। এই রকম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিস চাইছে।"

"কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়। সব মানুষই সমান। সকলের বেঁচে থাকার সমান অধিকার। সকলের ভেতরে শক্তি আছে, সেই শক্তি জাগ্রত করো, সাহসী হও, নির্ভীক হও।"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এইভাবে সহজ ও সরল কথার মধ্য দিয়ে মানুষকে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জীবন গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। তাঁর বাণীতে যেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথাই ঘোষিত হয়েছে। মানুষকে ভালবাসার যে-মন্ত্র তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, তাকে বর্ণে বর্ণে সত্য ক'রে তুলেছিলেন তাঁরই শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের নাম তাই আজও ঘোষিত হচ্ছে একসঙ্গে।

॥ চোদ্দ ॥

১৮৮৬ সালের ১৫ই অগাস্ট সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণেশ্বরের নিজের ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হন। সে-সমাধি কিন্তু আর ভাঙ্গে না। চিরকালের মতো তিনি বিদায় নেন এই পৃথিবী থেকে।

এই মহাপ্রয়াণের আগের কয়েক মাস ঠাকুর তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়ে যে-সব আলাপ-আলোচনা করেন, যে-ভাবে তাঁদের আশীর্বাদ করে যান এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

গলায় ঘা হ'য়ে রামকৃষ্ণ হঠাৎ একদিন অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। সেই ঘা ক্রমশঃ বেড়ে যায় এবং তারই ফলে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নেন।

গলায় ঘা, কথা বলতে কষ্ট হয়, খেতে পারেন না ভালো ক'রে—তবু ভক্তজনের সঙ্গে কথা বলা তিনি বন্ধ করেন না। ফলে, অসুখ আরও বেড়ে যায়। তখন রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয় ক'লকাতায়, শ্যামপুকুরের এক বাড়িতে। সেখানে তাঁর চিকিৎসার ভার নেন একজন বড় ডাক্তার—ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার। চিকিৎসা করতে করতে তিনিও শেষে রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হ'য়ে ওঠেন।

চিকিৎসার ফলে একটু ভালো হ'য়ে ঠাকুর আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। কিন্তু অনবরত কথা বলা বন্ধ না করায়—ঘা আবার বাড়ে। আবার তাঁর খেতে কষ্ট হয়, কথা বলতে গেলে গলায় আবার বেদনা বোধ করেন। ঠাকুরের এই কষ্ট দেখে, ভক্তদের একজন ঠাকুরকে একদিন বল্‌লেন—"মাকে বলুন আপনার রোগ সারিয়ে দিতে। আপনি বল্‌লেই রোগ সারিয়ে দেবেন তিনি। আর, খেতে যে পারেন না মোটেই সে-কথাও বলুন।"

ঠাকুর সে-কথার কোনো জবাব দেন না। চুপ ক'রে থাকেন। শেষটায় ভক্তদের পীড়াপীড়িতে একদিন মন্দিরে গিয়ে মা-কালীর সঙ্গে কথা ব'লে এলেন।

—"বলেছিলেন কি মাকে? মা কী বল্‌লেন?"

হেসে বল্‌লেন পরমহংসদেব—"মাকে বল্‌লুম, মা গলার দরুন কিছু খেতে পারিনে, যাতে দু'টি খেতে পারি করে দে। তাতে মা তোদের দেখিয়ে বল্‌লেন, কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস? আমি আর তখন কথাটি কইতে পারলুম না।"

ভক্তদের মুখেও আর কথা নেই। কী বলবেন তাঁরা!

একদিনকার কথা। ঠাকর সেদিন কিছুটা ভালো আছেন। বিকাল বেলা কাপড়-মোজা প'রে লাটু-মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গঙ্গার ধারে বাগানে বেড়াতে গেছেন। ভক্তরাও সব ছিলেন আশে-পাশে। ঠাকুরকে বেড়াতে দেখে তাঁরাও তাঁর সঙ্গ নিলেন

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বড় ভক্ত। তিনি ঠাকুরকে ভগবানের অবতার ব'লে প্রচার করেছিলেন। ঠাকুরের কানেও সে-কথা গিয়েছিল। বাগানে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন গিরিশ সেখানেই আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে রামকৃষ্ণ বল্‌লেন—"গিরিশ, তুমি কী দেখেছ আমার সম্বন্ধে যে, অত কথা (অর্থাৎ, ঠাকুর যে ভগবানের অবতার) যাকে তাকে ব'লে বেড়াও? গিরিশ প্রথমটা অবাক্ হ'লেও, পরক্ষণেই আবেগের সঙ্গে জবাব দিলেন—"তুমিই ভগবান। আমার উদ্ধারের জন্য এসেছ। ব্যাস বাল্মীকি যাঁর কথা ব'লে শেষ করতে পারেননি, তাঁর কথা আমি আর কতটুকু বলতে পারি।"

গিরিশের এই ধরনের ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে ঠাকুরের বড় আনন্দ হ'লো। তাঁর সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা দিব্য জ্যোতি প্রকাশ পেল ঠাকুরের সর্বাঙ্গে। ভক্ত গিরিশ তা প্রত্যক্ষ ক'রে আনন্দে ব'লে উঠ্‌লেন—"জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।" বার বার ক'রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ধূলো নিতে লাগলেন। ঠাকুরও তাঁকে সানন্দে

আলিঙ্গন ক'রে ব'লে উঠ্লেন—"তোমাদের আর কি বলব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক্।"

অন্যান্য ভক্ত ও শিষ্যেরাও, ঠাকুরের দিব্যভাব দেখে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিলেন। ঠাকুরও তাঁদের সবাইকে আলিঙ্গন করে, 'চৈতন্য হোক্' ব'লে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ঠাকুরেব স্পর্শে ভক্তরা সেদিন যে আনন্দ পেয়েছিলেন, যে পুলক-রোমাঞ্চ তাঁদের জেগেছিল—সে রকমটা নাকি সাধারণ মানুষের স্পর্শে কখনও হয় না।

এদিকে ঠাকুরের অসুখ কিছুতেই সারেনা। দু'দিন ভালো থাকেন তো পাঁচদিন শয্যাশায়ী। তরুণ ভক্ত-শিষ্যেরা পালা ক'রে রাত জাগেন, ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করেন। নরেন (বিবেকানন্দ) তো দিনরাত ঠাকুরের কাছে-কাছেই। তাঁর আর সংসারে মন নাই। বাড়িঘর ছেড়ে, তিনি দিন রাত গুরুর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন।

তিরোধানের কয়েক মাস আগে, নরেন এবং অন্যান্য শিষ্যদের ডেকে বল্লেন—"আজ তোদের একটা কাজ করতে হবে। আজ তোরা সকলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ক'রে আয় দেখি। গুরুর কথায় শিষ্যরা তো বেরিয়ে পড়লেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা তাঁদের। কেউ করলো উপহাস, কেউ দিল উপদেশ। কোনো দিকে না তাকিয়ে, সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে নরেন ও তাঁর গুরুভাইয়েরা ভিক্ষা ক'রে ফিরলেন। ভিক্ষার সেই পবিত্র অন্ন খেলেন সবাই মহানন্দে। এইভাবে ঠাকুর পরীক্ষা করলেন সকলকে।

শিষ্যেরা আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়ে কষ্টের পথে, বৈরাগ্যের পথে চলতে সক্ষম হয়েছে কিনা—ঠাকুর তাই চেয়েছিলেন পরীক্ষা করতে। পরীক্ষায় কিন্তু জয়ী হ'লো তাঁর শিষ্যেরা।

এর দিন কয়েক পরে ঠাকুর শিষ্যদের ডেকে বৈরাগ্যের চিহ্নস্বরূপ তাঁদের গেরুয়া কাপড় পরতে দিলেন। তারপর একে একে তাঁদের সকলের কানে দিলেন দীক্ষামন্ত্র। নরেনকে উদ্দেশ করে ঠাকুর তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের দেখিয়ে বল্‌লেন—"এদের সকলের ভার তোর উপর। এদের তুই দেখবি, চালাবি, শিক্ষা দিবি।"

সন্ধ্যাবেলায় নরেন ধ্যানে বসেছেন। একভাবে ব'সে আছেন অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে তাঁর মাথা ঘিরে এক জ্যোতি-চক্র দেখা দিল। উজ্জ্বল সেই জ্যোতি। দেখতে দেখতে সেই দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে। রামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যেন কিছুক্ষণের জন্য ডুবে গেলেন জ্যোতির সমুদ্রে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, তিনি যেন পৃথিবী ছেড়ে কোথায় ছুটে চলেছেন। ভয়ে তিনি চিৎকার ক'রে উঠতেই তাঁর বাহ্য চেতনা একেবারে লোপ পেয়ে গেল। গুরুভাইরা তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেন যে দেহ একেবারে নিস্পন্দ, হিমশীতল। ঠাকুর শুনে বল্‌লেন —"আচ্ছা বেশ! থাক এখন অমনি ভাবে। আমায় বড্ড জ্বলাতন করছিল এজন্য।" সকলে তখন বুঝলো নরেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য বিভূতি লাভ করেছেন—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ মিলেছে তাঁর—তাই অমন নির্বিকল্প সমাধি।

এইভাবে কাটলো কিছুদিন।

ঠাকুরের অসুখ কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নরেন ও অন্যান্য শিষ্যদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। আহার-নিদ্রা তাঁদের যেন ঘুচে গেছে।

একদিন নরেনকে কাছে ডেকে পাঠালেন পরমহংসদেব। তাঁর ইঙ্গিতে অন্যান্য শিষ্যরা ঘর থেকে বাইরে চ'লে গেলেন। তখন তিনি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নরেনের সামনে বসলেন। তারপর একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নরেনের দিকে। ঠকুরের দৃষ্টিতে কি তেজ। নরেনের মনে হ'লো, ঠাকুরের চোখ থেকে যেন তীব্র এক বিদ্যুৎ-শক্তি ঠিকরে পড়ছে। সেই দৃষ্টির তীব্রতায় নরেন চেতনা হারিয়ে ফেল্‌লেন একেবারে। জ্ঞান হ'লে টের পেলেন যে, তাঁর নিজের মধ্যে যেন একটা অসাধারণ শক্তি বিরাজ করছে। একধারে অফুরন্ত আনন্দ আর অসীম শক্তি।

কিন্তু ঠাকুরের দিকে তাকাতেই নরেনের বুকটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো। চির-আনন্দময় ঠাকুরের মুখখানি আজ এমন বিষন্ন কেন! দু'চোখ দিয়ে নেমে আসছে অশ্রুর বন্যা। কী হ'লো রামকৃষ্ণের, উদ্বিগ্ন হ'য়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলেন—"কাঁদছেন কেন?" ঠাকুর তখন নরেনের হাত দু'টি ধ'রে আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লেন—"ওরে, তোকে আমার সব দিয়ে আজ আমি নিস্বঃ হলুম। নিজের কিছুই আর রাখিনি। আমার সমস্ত শক্তি উজাড় ক'রে তোর ভেতরে ঢেলে দিয়েছি। এর-ই বলে তুই বিশ্ব-বিজয় করবি।"

ঠাকুরের সে-কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। বিশ্ব-বিজয় করেছেন নরেন্দ্রনাথ। তাই তো আমরা তাঁকে বলি—বিশ্বজয়ী

সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের যে প্রতিষ্ঠা আজ হয়েছে, তার সূত্রপাত করেন তিনিই।

সে ১৮৯৩ সালের কথা। তার সাত বছর আগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছেন। তখন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের বাণী প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন সারা ভারতে। ভারতের বাইরেও কি ক'রে তাঁর বাণী প্রচার করা যায়, কি ক'রে ভারতের কাছ থেকে সারা বিশ্ব সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী শুনতে পায়, বিবেকানন্দ ভাবছিলেন সে-কথা। সে-সুযোগও পেয়ে গেলেন তিনি।

১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিরাট এক ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। বিবেকানন্দও গেছেন ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু সেখান-কার কেউ তাঁকে বড় একটা আমোল দিচ্ছেন না। কারণ, সে-সময়কার আমেরিকায় কালা-আদ্‌মিদের (যদিও বিবেকা-নন্দের গায়ের রং কালো ছিল না) কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। আফ্রিকা, ভারত প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা অবহেলাই করত

কিন্তু শিকাগোর সেই ধর্মসম্মেলনে গেরুয়াবসন পরিহিত ভারতীয় প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর সুমধুর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে আমেরিকার নরনারীকে 'ভাই ও ভগিনী' সম্বোধন ক'রে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, তখন সবাই অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। নিস্তব্ধ হ'য়ে সবাই শুনলেন তাঁর

আবেগপূর্ণ প্রাণ-মাতানো বক্তৃতা, হিন্দুধর্মের অপূর্ব ব্যাখ্যা। তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ ও শেষ হবার মুহূর্তে সারা সম্মেলন-কক্ষ তুমুল করতালি-ধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের এ-কথা সহজ ও সুন্দর ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম বিশ্ব-মানবতা স্বীকার করে; অর্থাৎ হিন্দুধর্মে আছে সারা পৃথিবীর লোককে নিজের ব'লে গ্রহণ করবার নীতি। তাছাড়া, এ-কথাও তিনি স্পষ্ট ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সব ধর্মের উদ্দেশ্যই এক, কোনো ধর্মই অন্য কোনো ধর্মের চেয়ে বড় নয়, যে কোনো ধর্মের পথেই মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারে। এমন ক'রে ধর্মের ব্যাখ্যা আর কেউ করেননি। তাই, লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উঠেছিল।

স্বামীজীর বক্তৃতা থেকেই সাগর-পারের অধিবাসীরা জানতে পারেন প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি, সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক থেকে ভারতবর্ষ কত উন্নত, ধর্মের দিক থেকে ভারতবর্ষ কত সহনশীল। বিশ্বের দরবারে তিনিই প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তথা ভারতবর্ষের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী আজও বিশ্বের নরনারীকে অনুপ্রাণিত করছে।

॥ পনের ॥

সাধারণ বিচারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অশিক্ষিত হ'লেও, তিনি যে-ভাবে গল্পচ্ছলে এবং তাঁর নিজস্ব সহজ ও সরল ভাষায় তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়, মনে হয়—তিনি অশিক্ষিত হ'লেও, ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। পুঁথি প'ড়িয়ে যে-শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সম্ভব হয়েছিল তাঁর মুখের বাণীতে। গল্পচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের কিভাবে শিক্ষা দিতেন তার আরও কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে—

কি ক'রে ঈশ্বরে মন হয়, এই প্রশ্নের জবাবে ঠাকুর বলেছেন—"ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না! মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গোরুতে খেয়ে ফেলে! ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে।"

সংসারে বাস করেও কিভাবে ঈশ্বরে মন রাখা সম্ভব সে-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—

"সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত

আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড়মানুষের দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু, মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান? —আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারে সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।···তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন—"ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?"

তার জবাবে ঠাকুর বল্‌লেন—"হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, তাঁর নামগুণ গান, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।···খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

ডাক দেখি মন ডাকার মতো, কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও—
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'লো। তারপর সূর্য দেখা দেবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন। ...কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালোবাসে। এই তিনজনের ভালোবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন-লাভ হয়। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁসেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

অন্ধ-বিশ্বাস ভালো নয়, কে সৎ কে অসৎ, সে-বিচার মানুষকেই করতে হয়। এ-সম্পর্কে ঠাকুর একদিন বিবেকানন্দকে (তখনও তিনি নরেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত) একটি মজার গল্প বলেছিলেন—

"একটা গল্প শোন্। কোনো এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময় একটা রব উঠ্‌লো—কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগ্‌লা হাতী যাচ্ছে। সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জানে, হাতীও

যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব! এই ব'লে দাঁড়িয়ে রইলো। নমস্কার ক'রে স্তবস্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌ছে—পালাও, পালাও। শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটি শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ও অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইলো। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। আর ওষুধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি, হাতী আসছে শুনেও কেন চ'লে গেলে না? সে বল্‌লে, গুরুদেব যে আমায় ব'লে দিয়েছিলেন, নারায়ণই মানুষ, জীব-জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী-নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে স'রে যাই নাই। গুরু তখন বল্‌লেন—বাবা, হাতী-নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত-নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তাঁর কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।...

"সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু, অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে না। মাখামাখি চলে না।...ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।"

একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহাশয়, যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহ'লে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত?"

এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বল্‌লেন—“লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে একটু তমোগুণ দেখানো দরকার! কিন্তু সে অনিষ্ট করবে ব'লে, তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। এক মাঠে এক রাখাল গোরু চরাতো। সেই মাঠে এক ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন এক ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্‌লে—ঠাকুরমশাই! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্‌লে—বাবা, তা হোক! আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা ব'লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ'লে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে আসতে-না-আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটি কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প'ড়ে রইলো। ব্রহ্মচারী বল্‌লে, ওরে তুই কেন পরের অনিষ্ট ক'রে বেড়াস? আয় তোকে মন্ত্র দেব। মন্ত্র জপ্‌লে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা-প্রবৃত্তি থাকবে না। এই ব'লে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি ক'রে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্‌লেন—এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করিস না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্‌লে, আমি আবার আসব।

"এই রকম ক'রে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবু রাগ হয় না। যেন কেঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। এদিকে একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধ'রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে দিলে! সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্তে লাগলো আর সে অচেতন হ'য়ে পড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে, সাপটা ম'রে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চ'লে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'লো। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চ'লে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নেই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাইরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে একবার চরতে আসতো; ভয়ে দিনের বেলা আসতো না। মন্ত্র নেওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে প'ড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বল্লে সে সাপটা ম'রে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হ'লো না। সে জানে, যে-মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলো। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে তুই কেমন আছিস? সে বল্লে—আজ্ঞে, ভালো আছি। ব্রহ্মচারী

বল্‌লে—তবে তুই এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন? সাপ বল্‌লে —ঠাকুর, আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা করিস না। তাই, পাতাটা, ফলটা, খাই ব'লে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি। ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারও উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্‌লে,—শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না। অবশ্য আরও কারণ আছে। ভেবে ছ্যাখ্‌। সাপটার মনে পড়লো যে, রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্‌লে, ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানেনা যে, আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাউকে কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন ক'রে জানবে ?

ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "ছিঃ! তুইএত বোকা আপনাকে রক্ষা করতে জানিস্ না। আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস্ করতে নয়! ফোঁস্ ক'রে তাদের ভয় দেখাস্‌নি কেন?"

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস্ করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই অনিষ্ট করতে নাই।"

ভক্ত-ই ভগবানকে লাভ করে, ভক্তের হৃদয়েই ভগবান বিরাজ করেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন—

"ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন, কোনো জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানেই থাকতে পারেন। কিন্তু

তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।”

রামকৃষ্ণ বলতেন, সকলের ঈশ্বরই এক, কেবল নামের তফাত। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিনকার এক সভায় বলেন— “যেমন জল, ওআটার, পানি। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে ‘জল’। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে ‘পানি’। আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে ‘ওআটার’। তিনি এক-ই, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে—আল্লা, কেউ বলছে গড্, কেউ বল্‌ছে—ব্রহ্ম।”

কালী-র রং কালো কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছেন—“কালী কি কালো? দূরে, তাই কালো। জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছ্যাখো, কোনো রং-ই নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছ্যাখো, রং নাই।

মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপ দিগম্বরী হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥”

মন ঠিক থাকলেই মানুষ ঠিক থাকে, মন বেগ্ড়ালেই মানুষ বেগ্ড়ায়। এই সত্যকে কেমন সুন্দর ক’রে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—

“মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপ্‌বে। যেমন, ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও

সবুজ। যে রঙে ছোপাও, সেই রঙেই ছুপ্‌বে। দেখনা, যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অম্‌নি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে ফুট্‌ ফাট্‌, ইট্‌ মিট্‌ (Eat meat)! আবার পায়ে বুটজুতা, শিষ্‌ দিয়ে গান করা। এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো, সেইরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা, এইসব হবে।"

'ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা করা অসঙ্গত।' পরমহংসদেব এই প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—

"হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে (ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে কালীবাড়িতে গিছ্‌লো। আমি বল্‌লুম তোমরা কি রকম লেক্‌চার দাও, আমি শুনবো। তা, গঙ্গার ঘাটে চাঁদ্‌নিতে সভা হ'লো, আর কেশব বল্‌তে লাগলো। বেশ বল্‌লে। আমার ভাব হ'য়ে গিছ্‌লো। পরে কেশবকে আমি বল্‌লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?— 'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ, এই সব?' যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালোবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজবাবু (মথুরানাথ) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্‌তে লাগলো, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!' আমি সেজবাবুকে বল্‌লুম—ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা

করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা! ছিঃ! অমন হীনবুদ্ধির কথা বল্‌তে নাই। কী ঐশ্বর্য তুমি তাকে দিতে পার? তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়, তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত জন দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, তার ক'টি ভাই, এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দাও! তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি।

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজলে পাবি, হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌ জন।
কবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥"

মিথ্যা গৈরিক ধারণ আর বৈরাগ্যের ভানকে ঠাকুর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"বৈরাগ্য তিন-চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্ব'লে গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশিদিন থাকে না! হয়তো কর্ম নাই, গেরুয়া প'রে কাশী চ'লে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে

বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না। আবার সব আছে, কোনো অভাব নাই, কিছু ভালো লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে-বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য। মিথ্যা কিছুই ভালো নয়। মিথ্যা ভেক্ ভালো নয়। ভেকের মতো যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বল্‌তে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!"

অহঙ্কার পতনের মূল। বিশেষ ক'রে যারা টাকার বড়াই করে। পরমহংসদেব এই সম্পর্কে তাঁর ভক্তদের একদিন সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ এই সবের অহঙ্কার করে। এ-সব দু'দিনের জন্য। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গান আছে—

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্তা ব'লে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে॥

আর, টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বলো, আমি ধনী,—তো ধনীর আবার তার বাড়া, তারও বাড়া আছে।

সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা ওঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ'লো, সূর্য উঠেছেন। চন্দ্র মলিন হয়ে গেল, খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না। ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহ'লে ধনের অহঙ্কার থাকে না।"

'আগে বিদ্যা (জ্ঞান-বিচার)—না, আগে ঈশ্বরলাভ ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন—

"শাস্ত্র কত পড়বে ? শুধু বিচার করলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন। বই প'ড়ে কি জানবে ? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায় দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।...বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়্‌কুটো বোধ হয়।"...

"বই শাস্ত্র এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে নেবার পর, আর বই-শাস্ত্রে কী দরকার! তখন নিজে কাজ করতে হয়। একজন একখানি

চিঠি পেয়েছিল, কুটুম্ব বাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন ব্যস্ত হ'য়ে চিঠি খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক জন মিলে খুঁজলে। শেষে পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হ'য়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কী লেখা আছে। লেখা এই পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি! তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা। শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে নিজে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ!"

সংসার ও সন্ন্যাসের জ্ঞান সম্পর্কে ঠাকুর যে-কথা বলেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো—

"যদি বল, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী এ দু'য়ের তফাত কাছে কিনা, তার উত্তর এই যে দুইই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী, উটিও জ্ঞানী—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে।...কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সেয়ানাই হও না কেন, কালো দাগ একটু-না-একটু গায়ে লাগবেই। মাখন তুলে যদি নতুন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ,

সন্দেহ হয়। খই যখন ভাজা হয় দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপরে যে-সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মতো হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকাফুলের মতো দাগশূন্য হয়। আর, জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হয়।"

ঠাকুর বহুবার এ-কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, সরলতা না থাকলে মানুষের পক্ষে চট্ করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হওয়া সম্ভব নয়। মনের সরলতাই মানুষের মনে বিশ্বাস আনে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রসঙ্গেই একবার তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—

"সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার এই সব!···কেশব সেন কি সরল ছিল। ···বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গোরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক দুধ দেয়। যে গোরু শাক-পাতা, খোসা-ভূষী, যা দাও গব্ গব্ ক'রে খায় সে গোরু হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয়। বালকের মতো বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ও তোর দাদা, বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা বলেছেন, জুজু আছে। ষোল আনা বিশ্বাস, যে ও-ঘরে জুজু আছে। এইরূপ

বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস-ত্যাগ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—

"সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ওষুধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার।...

"বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ওষুধ খেও হে'—এই কথা ব'লে চ'লে যায় সে অধম বৈদ্য, রোগী খেলে কি না এ খবর সে নেয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ওষুধ খেতে অনেক ক'রে বোঝায়, মিষ্টি কথা বলে—'ওহে ওষুধ না খেলে কেমন ক'রে ভালো হবে? লক্ষীটি খাও, আমি নিজে ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি খাও"—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনো মতে (ওষুধ) খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ওষুধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।...

"বৈদ্যের মতো আচার্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোনো খবর নেন না, তিনি অধম আচার্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বোঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালোবাসা দেখান—তিনি মধ্যম আচার্য। আর যখন শিষ্যরা কোনো মতে শুনছে না দেখে, কোনো আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাকে বলে উত্তম আচার্য।"

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও ঠাকুর বড় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয়-বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন, পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে-কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দু'টি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান-কাঁটাটি আনতে হয় তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তিনি (ঈশ্বর) যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।"

অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ তো মুখে বলা সম্ভব নয়—সে-রূপের আদিও নেই, অন্তও নাই। সে-রূপ অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর একবার তাঁর ভক্তদের কাছে বলেছিলেন—

"তাঁর (ঈশ্বরের) ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই, ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হ'য়ে দেখা দেন। ...জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে, বোধ করে। তিনি যে কী, মুখে বলতে পারে না। কি রকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—

কূল-কিনারা নাই—ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ, ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞানসূর্য উঠ্‌লে সে-বরফ গ'লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না। —তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বল্‌বেন তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। প্যাঁজের লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খোঁজেই বা কে? —সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপবোধে বোধ, কিরূপ হয়, কে বলবে! একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। সমুদ্রে যেই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক? পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। তখন আমি-রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না। বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্‌ফড়্‌ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।"

॥ ষোল ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা ভাবলেই মনে হয়, অমন মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা তিনি নিজেই। অতুলনীয়, অনন্য-সাধারণ মানুষ তিনি।

তাঁর বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। তিনি বল্‌তেন—মানুষকে নারায়ণের অংশ ব'লে মনে ক'রে তার সেবা করবে, তার কষ্ট দূর করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না, অবহেলা করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সারা বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু। সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে, তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ ও সেবার ব্রত গ্রহণ করতে সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। ত্যাগ ও সেবাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ত্যাগ ও সেবাই যে মানুষকে বড় ক'রে তোলে, এই শিক্ষাই তিনি দিয়ে গেছেন নিজের আচার ও আচরণের মধ্য দিয়ে।

তিনি বল্‌তেন—"মনকে বিশুদ্ধ ও নির্মল ক'রে তোল, তবেই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে গেছেন পরোপকার-বৃত্তি। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন'—যে মিশনের প্রধান কাজই হ'লো পরের সবরকম উপকার করা, পরের সেবা করা।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"-রচয়িতা শ্রীম লিখেছেন—"ঠাকুর সর্বধর্মসমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধনা করিয়া, অপর দিকে, আল্লা-মন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে-ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতর্‌কে উদ্ধার করিতেছেন, এ-ছবিও ছিল।"

এ থেকেই বোঝা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাসাধক। সব ধর্মকেই তিনি সমান মর্যাদা দিতেন, সমান শ্রদ্ধা করতেন।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমা রঁ্যালা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে কোনো এক জায়গায় বলেছিলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ একাই হলেন তিনশ' কোটি লোকের তু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ।" আমরাও সেই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে যুগপ্রবর্তক এই মহাসাধকের উদ্দেশে আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

—সমাপ্ত—